୨୪୧୯

পল্লীসেবক উপেন্দ্রনাথ

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস

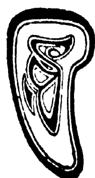
২২।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, বি-এ
৬৪।২ মাণিকতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ
অগ্রহায়ণ ১৩৪৭
দাম দশ আনা

প্রিণ্টার—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিঃ
৯৩এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আশীর্ব্বাদ



ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত সুধীমোহন

পল্লীর উন্নতি সাধন উদ্দেশে যিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন পুণ্যস্মৃতি সেই উপেন্দ্র রায় মশায়ের জীবনচরিত রচনায় তোমার অধ্যবসায় পল্লীহিতৈষীমাত্রেরই আনন্দের বিষয়। এই উপলক্ষ্যে তোমাকে সাদরে আমার আশীর্ব্বাদ জানালেম।

ইতি ১০/৪/৪০ শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭৪৯৫

ভূমিকা

এই পুস্তকে যাঁহার জীবন-চরিত বর্ণনা করিলাম, তাঁহার কর্ম্মজীবন আমাকে বিমুগ্ধ করিয়াছে। তাঁহার চরিত্রের যে গুণটি আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট করিয়াছে তাহা হইতেছে তাঁহার পল্লীপ্রীতি বা গ্রাম-সেবা। একথা সরল ভাবেই বলি যে, পল্লীগ্রামের প্রতি আমার একটা প্রবল আন্তরিক আকর্ষণ আছে। তাহা আমার কবিজনোচিত মনোভাবের জন্য কতকটা হইতে পারে। যে কারণেই হউক, পল্লীগ্রামের মাটী, ঘাস, পুকুর, গাছপালা, পশুপক্ষী ও সরল মানুষ আমার অত্যন্ত প্রিয়। সেইজন্য যখনই আমি পল্লীসেবক উপেন্দ্রনাথ সাউ মহাশয়ের পল্লীপ্রীতি অনুভব করিতে পারিলাম তখনই তাঁহার সহিত কেমন একটা আত্মীয়তার বন্ধন বোধ করিয়াছি। সেইজন্যই তাঁহার পুণ্য চরিত রচনা করিতে আমার প্রবল আগ্রহ জন্মে এবং সেই আগ্রহের ফলেই এই আমার চরিতাখ্যান রচনার প্রচেষ্টা।

উপেন্দ্রনাথ ধনী হইয়াও নিরহঙ্কার, প্রবল হইয়াও দুর্ব্বলের পোষক, শক্তিমান হইয়াও দয়াবান এবং কঠোর-ব্যবসা-লিপ্ত হইয়াও ছায়াশীতল শান্তিময় বঙ্গপল্লীর স্নেহক্রোড়ের দুলাল-সন্তান। মানুষটিকে বুঝিবার ও

বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কত দূর সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছি তাহা সুধী পাঠক বিচার করিবেন।

বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতি ব্যবসাকার্য্যে উদ্যত হোক এবং বাঙ্গলার কেন্দ্রস্থল যে পল্লীগ্রাম তাহাকে ভালবাসিয়া সমুন্নত করুক—ইহাই এই কঠোর-জীবনদ্বন্দ্বময় যুগে বাঙ্গালীর জীবনরক্ষার একমাত্র উপায়। এই উপায় অবলম্বন করিয়া যাঁহারা বাঙ্গালীর নাম ও ইতিহাস উজ্জ্বল করিয়াছেন তাঁহাদের অন্যতম হইতেছেন ধান্যকুড়িয়ার স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ সাউ মহাশয়। তাঁহার জীবন-কথা দেশের শিক্ষিত কর্ম্মহীন যুবকদের কাছে একটা বৃহৎ আদর্শের সন্ধান হয়ত দিতে পারিবে, এই ভরসায় আমার এই গ্রন্থ রচনার প্রয়াস। তিনি নিজের যে বিপুল অর্থ আপন পল্লীর উন্নতির জন্য ব্যয় করিয়াছেন তাহা হয়ত পল্লী-উন্নতিকামী অনেক শিক্ষিত লোকের নাই। কিন্তু তিনি যে অদম্য আগ্রহে পল্লীর উন্নতি সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন সে আগ্রহ হয়ত অনেকেরই আছে। অর্থাভাবে সেরূপ উন্নতি একেবারেই সাধিত হইতে পারিবে না এরূপ বিশ্বাস আমার নাই, বরং এই বিশ্বাস আমার আছে যে, আগ্রহ থাকিলে সৎকার্য্যে অর্থের অভাব ঘটে না—তাহা কতকাংশেও সম্পন্ন করা যায়। এই পুস্তক পড়িয়া অনেকের মধ্যে হয়ত উপেন্দ্রনাথের আগ্রহ ও নিষ্ঠা সংক্রামিত হইতে পারিবে এবং তাহারই ফলে গ্রামোন্নতির কাজে তাঁহারা উদ্যোগী হইয়া উঠিবেন, এই

আশা পোষণ করি ; এবং সেই আশাতেই এই পুণ্য-চরিত পল্লীসেবকের জীবন-কথা সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে সাহসী হইলাম।

পূজনীয় কবি রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমানে অদ্বিতীয় কবি তো বটেই, আবার তিনি এক অনন্যমনা পল্লীসেবক বা পল্লী-সংগঠক। বাঙ্গলার গ্রামগুলিকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহার ভুরি ভুরি উক্তি ও সুনির্দ্দেশ তাঁহার রচনায় পাওয়া যায়। তাঁহার এই পল্লীগঠনের আগ্রহ মূর্ত্তি লাভ করিয়াছে তাঁহার শান্তিনিকেতনের শ্রীনিকেতন বিভাগে—যাহার একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে গ্রাম্য হিতসাধন। সেইজন্য এই পুস্তক রচনার সময়ে আমি রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে তাঁহার শুভ-কামনাময় নির্দ্দেশ প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তিনি অপটু শরীরেও অশেষ-স্নেহ-গুণে এই সম্পর্কে আমাকে যে উৎসাহ-মুলক আশীর্ব্বাদ পাঠাইয়াছেন তাহা এই পুস্তকের প্রারম্ভে দেওয়া হইল। তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছি বলিয়া লজ্জা বোধ করি, আবার তাঁহার স্নেহ লাভ করিয়াছি বলিয়া গৌরব বোধ করি। যাহা হউক, আমি তাঁহার নিকট যে কত ঋণী রহিলাম তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে আমি অক্ষম।

এই পুস্তক রচনাকালে আমি সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের রচিত "স্বর্গীয় রায় উপেন্দ্রনাথ সাউ বাহাদুরের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা" নামক পুস্তক হইতে বিশেষ সহায়তা লাভ করিয়াছি। আর ধান্যকুড়িয়ার

কতিপয় প্রবীণ ভদ্র মহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে উপেন্দ্রনাথের জীবনের অনেক ঘটনার বিবরণ প্রদান করিয়া আমার কাজ সুগম করিয়া দিয়াছেন। নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয়ের রচিত প্রবন্ধ, জ্যোতিশ্চন্দ্র দাস প্রণীত National Biography for India, লক্ষ্ণৌ নিওয়াল কিশোর প্রেস হইতে প্রকাশিত Who's Who in India ও বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা হইতেও আমি উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। ইঁহাদের সকলের নিকটেই আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম।

কলিকাতা
অগ্রহায়ণ ১৩৪৭

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

সূচীপত্র



রায় উপেন্দ্রনাথ সাউ বাহাদুর

পল্লী-সেবক উপেন্দ্রনাথ

সূচনা

পৃথিবীতে সাধারণতঃ তিন রকমের মহৎ লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এক আসেন চিন্তাবীর; দ্বিতীয় আসেন ধর্ম্মনেতা; এবং তৃতীয় আসেন কর্ম্মবীর—যাঁহারা বৃহৎ মানব-কল্যাণকর চিন্তাকে কর্ম্মে অভিব্যক্ত করেন। এই তিন জাতীয় মানবকেই প্রতিভার অধিকারী বলা যায়। প্রতিভা হইতেছে সেই শক্তি, যাহা কোনো অদৃশ্য পরিচালনায়, গোপন জীবন-তেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়াই আসে, এবং সাধারণ বুদ্ধির অগম্য কৌশলে পৃথিবী উজ্জ্বল করিয়া তোলে।

আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে অনেক সময় মনে করি, প্রতিভার আবির্ভাব একটা আকস্মিক ব্যাপার। ব্যাপারটা কতকটা আকস্মিক বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। প্রতিভার আবির্ভাব অনেকটা যুগ-প্রয়োজনে বা জনগণ-চিত্তের আগ্রহের

প্রাবল্যেই ঘটিয়া থাকে। কথাটা বুঝাইয়া বলি। ধরা যাক, বঙ্গ-সাহিত্যে চণ্ডীদাসের আবির্ভাব। চণ্ডীদাস যে-কাব্য যে-ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন তাহা লিখিবার ও প্রকাশ করিবার আগ্রহ যে জনগণ-চিত্তে কতকটা ছিল তাহার প্রমাণ তৎ-কালীন সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া যায়। যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বিচিত্র রূপ চণ্ডীদাসের কাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার অনুভূতি ও প্রকাশ চণ্ডীদাসেরই পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক কয়েকজন স্বল্পশক্তি-বিশিষ্ট কবির রচনায় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই কবিগণের বোধশক্তি বা প্রকাশশক্তি তত গভীর বা প্রবল ছিল না। চণ্ডীদাস আসিলেন এমন শক্তি লইয়া যাহা দ্বারা তিনি তৎকালীন অসংবদ্ধ ও শিথিল বোধশক্তিকে সংবদ্ধ, সুদৃঢ় ও সুসমঞ্জস করিয়া যুগের আকৃতিকে আপনার মধ্য দিয়া অপরূপ কৌশলে প্রকাশ করিলেন। এই প্রকাশ-কার্য্যটি যেন তাঁহারই অপেক্ষায় বসিয়াছিল; তাঁহাকে পাইবামাত্রই তাঁহাকে অধিকার করিয়া ফুটিয়া উঠিল। সুতরাং চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকে একেবারে আকস্মিক বলি কি করিয়া? যুগের প্রভাব ও তাগিদ চণ্ডীদাস-প্রতিভাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে।

আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের কথা এবং রবীন্দ্রনাথের কথাও এই প্রসঙ্গে বলা চলে। বাঙ্গালী ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়া ইংরেজী রোম্যান্স ও দেশ-প্রীতি-রস আস্বাদ করিবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাহারই রূপ যখন আপনার সাহিত্যে অভিব্যক্ত

দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইল তখনই বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটিল। আর আধুনিক বাংলা কাব্যে ঔপনিষদিক ও বৈষ্ণবীয় রসধারা এবং অতীন্দ্রিয়তা বা স্বপ্নবিলাসের সঙ্গে যখন ইংরেজী সাহিত্যের সাম্য ও স্বাধীনতার শক্তিময় আবেগের সমন্বয় বাঙ্গালী দেখিতে চাহিল তখনই আমরা পাইলাম রবীন্দ্রনাথকে। প্রতিভা যে যুগ-প্রয়োজনে মানব-সমাজকে পরিতৃপ্ত ও সমুন্নত করিতে আসে তাহাতে সংশয় নাই।

ধর্ম্মনায়কদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা; যখনই যেখানে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় ঘটে তখনই সেখানে ধর্ম্মবীরগণ আবির্ভূত হন,—এ কথা তো শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন। এ যুগে রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দ ইহার দৃষ্টান্ত-স্থল।

এইবার আধুনিক কালের একটি কর্ম্ম-প্রতিভার কথা বলি। তিনি রাশিয়ার টলষ্টয়। টলষ্টয় এক অপূর্ব্ব যুগ-প্রবর্ত্তক প্রতিভা। তাঁহার সমসাময়িক রাশিয়া চিন্তায় ও কর্ম্মে যে অধঃপতনের মধ্যে নামিয়া গিয়াছিল তাহা হইতে রাশিয়াকে রক্ষা করিবার জন্য একটা ব্যাকুলতা আংশিক ভাবে সে দেশের লোকের হৃদয়ে জাগ্রত হইয়াছিল। টলষ্টয় আসিলেন অনুভব করিবার ও প্রকাশ করিবার অসাধারণ শক্তি লইয়া। জনগণের দুঃখনিবারণের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মধ্যে সংহত হইল, প্রকাশিত হইল। তিনি চিন্তা

করিলেন রাশিয়ার মঙ্গল, কর্ম্মে ফুটাইলেন দেশেরই মঙ্গল। তিনি যুগ-প্রয়োজনের এক অপূর্ব্ব প্রকাশ। আমাদের মহাত্মা গান্ধীও এইরূপই এক অপূর্ব্ব প্রকাশ।

এই জাতীয় কর্ম্মবীরদেরই আমি তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিভা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজসংস্কার, পল্লীগঠন প্রভৃতির ক্ষেত্রে এই জাতীয় প্রতিভার শক্তি পরিস্ফুট। বাঙ্গলাদেশে আধুনিক কালে সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, আনন্দমোহন, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি রাজনীতি-ক্ষেত্রে; রামমোহন, বিদ্যাসাগর, গুরুদাস, আশুতোষ প্রভৃতি শিক্ষায় ও সমাজ-সংস্কার-ক্ষেত্রে; রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বটকৃষ্ণ পাল, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি ব্যবসায়-ক্ষেত্রে; চিত্তরঞ্জন, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, কালীমোহন ঘোষ প্রভৃতি পল্লী-গঠন-কার্য্যে যে-শক্তি দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা প্রতিভারই নামান্তর।

এই শেষোক্ত কার্য্যে যাঁহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাঁহারা যুগোপযোগী এক মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছেন। দেশহিতকামী ব্যক্তিমাত্রেই আজ উপলব্ধি করিতেছেন যে, গ্রামের উন্নতি সাধনেই বঙ্গদেশের তথা ভারতবর্ষের উন্নতি। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, এবং এই কৃষির ক্ষেত্র বা জন্মস্থান হইতেছে গ্রামগুলি। আমাদের মধ্যে অনেকে শহরবাসী হইয়া পড়িলেও এ কথা সকলেই জানেন বা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন যে, জীবনরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত

দ্রব্যই এই "ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি" আমাদিগকে দান করিতেছে। গ্রামগুলি আমাদের জীবনকেন্দ্র বা মর্ম্মস্থল। এই মর্ম্মস্থল যদি সুস্থ, সবল, পরিচ্ছন্ন ও সুশিক্ষিত থাকে তবেই সমগ্র দেশবাসীর রক্ষা; আর তাহা না থাকিলে সকলেরই দুর্দ্দিন। পাশ্চাত্য শিক্ষার স্বদেশবিমুখ মনোভাবের মধ্যে বৰ্দ্ধিত হইয়াও আমরা যদি আজ পল্লীকে জননীর মত ভালবাসিতে পারি এবং গ্রামের উন্নতি-বিষয়ক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করি তবেই আমরা আমাদের চিরন্তন মঙ্গলের সৃষ্টি করিতে পারিব।

দুইটি কাজ বর্ত্তমানে আমাদের বাঙ্গালীর জীবনে বিশেষভাবে গ্রহণীয় হইয়া উঠিয়াছে—প্রথম ব্যবসা-বাণিজ্য, দ্বিতীয় পল্লী-রক্ষা।

কেবল মাত্র গ্রামের উন্নতিতেই জীবন সমর্পণ করিয়াছেন এমন বাঙ্গালী দুই একজন যে না পাওয়া যায় তাহা নহে। আবার বাঙ্গালীর শ্রমবিমুখতার অপবাদ দূর করিয়া বিত্তহীন সহায়হীন একক জীবনে কঠোর ব্যবসায়-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া ধীরে ধীরে চরম উন্নতি লাভ করিয়াছেন, এমন বাঙ্গালীও দুর্ল্লভ নয়। এই প্রসঙ্গে আমি আজ এমন একজন বাঙ্গালীর কথা বলিব, যাঁহার জীবনে গ্রামোন্নতি সাধন এবং ব্যবসায়োন্নতি সাধন, এই দুই কর্ম্মের এক অপূর্ব্ব সম্মিলন ঘটিয়াছে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এই মহৎ ব্যক্তি প্রভূত বিত্তের অধিকারী জমীদার ছিলেন। অর্থবান ব্যক্তির

যে বিলাস ও আরামপ্রিয়তা তাহা তিনি বর্জ্জন করিয়া সারা জীবন শ্রান্তিহীন সৎকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। এই মহামনা ব্যক্তি হইতেছেন ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট মহকুমার অধীন ধান্যকুড়িয়া গ্রামের স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ সাউ।

বংশ-পরিচয়

যে পরিবারে উপেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন, তাহা শিক্ষা বা সমৃদ্ধিতে বিশেষ উন্নত ছিল না। তাঁহারা জাতিতে সৎ-চাষী এবং কৃষিকর্ম্মই তাঁহাদের জীবনের অবলম্বন ছিল। আধুনিক কালে কৃষিকর্ম্ম যেমন বাঙ্গালীর নিকট অবজ্ঞার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন তাহা একেবারেই হয় নাই বরং কৃষিকর্ম্ম তখন সকলেরই নিকট গৌরবের কার্য্য ছিল।

ইংরেজের আগমনের কিছু পূর্ব্বে অষ্টাদশ শতকের মধ্য-ভাগে ভারতে মোগলশক্তির প্রভাব খর্ব্বতা লাভ করে এবং সেই সুযোগে বহু লোভপরায়ণ অত্যাচারী ব্যক্তির অভ্যুদয় ঘটে। তাহাদের অত্যাচারে বঙ্গবাসী বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। আবার সুদূর মহারাষ্ট্র হইতে দলে দলে লুণ্ঠন-কারী বর্গীরা আসিয়া বাঙ্গালীকে ধনে-প্রাণে বিপর্য্যস্ত করে এবং বাঙ্গলার তৎকালীন নবাব আলিবর্দ্দী খাঁকে পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে। একবার নবাব মেদিনীপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় তিনি বর্গী বা মার্হাট্টা-দিগের দ্বারা আক্রান্ত হন, এমন কি বন্দী হইবার মত তাঁহার অবস্থা ঘটে। এই লুণ্ঠনকারী দল বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার

রাজধানী মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত গমন করিয়া লুণ্ঠন করিয়া আসে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "দেবীচৌধুরাণী" উপন্যাসে এই সময়ের বিশৃঙ্খলার অপর দিকের একটি চিত্র দিয়াছেন। তাহার কিয়দংশ এই—

"ভবানী, ওজস্বী বাক্যপরম্পরার সংযোগে দেশের দুরবস্থা বর্ণনা করিলেন, ভূম্যধিকারীর দুর্ব্বিসহ দৌরাত্ম্য বর্ণনা করিলেন। কাছারির কর্ম্মচারীরা বাকিদারের ঘর-বাড়ী লুঠ করে, লুকান ধনের তল্লাসে ঘর ভাঙ্গিয়া, মেঝ্যা খুঁড়িয়া দেখে, পাইলে একগুণের জায়গায় সহস্রগুণ লইয়া যায়, না পাইলে মারে, বাঁধে, কয়েদ করে, পোড়ায়, কুড়ুল মারে, ঘর জ্বালাইয়া দেয়, প্রাণবধ করে।......"

একদিকে বর্গীদের লুণ্ঠন, অপরদিকে অত্যাচারী জমীদার-দের প্রজা-ধর্ষণ। এই জাতীয় অরাজকতার মধ্যে দেশে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে সাধারণ গৃহস্থের সুখ ও শান্তি প্রায় বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছিল।

দেশের এই বিশৃঙ্খল অবস্থার সঙ্গে উপেন্দ্রনাথের পূর্ব্ব-পুরুষগণের জীবনের একটি কাহিনী জড়িত আছে। তাহা আজ হইতে প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা। উপেন্দ্র-নাথের দুই পূর্ব্বপুরুষ, দুই ভ্রাতা, যাদবরাম সাউ ও মাধবরাম সাউ দেশের এই দুরবস্থার মধ্যে পৈত্রিক বাসগ্রাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই বাসগ্রামের নাম ফতেপুর। ইহা





ধান্যকুড়িয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট মহকুমার মধ্যে অবস্থিত। এই স্থান ত্যাগ করিয়া পুত্রকলত্র ও যথাসম্ভব দ্রব্য-সম্পদ সঙ্গে লইয়া তাঁহারা কিছুদূর দক্ষিণ দিকে আসেন এবং ২৪ পরগণা জেলার উত্তর-পূর্ব্ব সীমায় গোবরডাঙ্গার নিকটে অবস্থিত কানোপুর নামক গ্রামে আসিয়া কিছুকাল বাস করেন। তারপর আবার তাঁহারা যোগ্য বাসস্থানের সন্ধানে অগ্রসর হন। ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশ নদী-নালায় পূর্ণ ও জঙ্গলে আবৃত ছিল। পথে বাঘের ভয় ও দস্যুর ভয় উভয়ই সমান ছিল। যানবাহনের একান্তই অভাব ছিল। এই বিষম বিঘ্ন ও বিপদের মধ্যে তুই ভাই সপরিবারে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। বসিরহাট মহকুমার বহু ভূস্বামীর নিকট তাঁহারা বাসের উপযোগী কয়েক বিঘা জমি প্রার্থনা করেন, কিন্তু তাঁহাদের এমনই তুর্ভাগ্য যে তাঁহারা অজ্ঞাত-কুলশীল বলিয়া কেহই তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিতে চাহিল না। তখন এই তুর্ভাগ্যপীড়িত তুই ভ্রাতা কোনদিন বা গাছের তলায়, কোনদিন বা খোলা মাঠে, রাত্রি যাপন করিয়া ভিখারীর মত দিন কাটাইতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা বসিরহাট হইতে কয়েক মাইল দূরে সুন্দর-বনের নিকটে বাসের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু এইখানেই তাঁহাদের তুর্ভাগ্যের শেষ হইল না। একদিন রাত্রিকালে এক ব্যাঘ্র আসিয়া তুই ভ্রাতার মধ্যে একজনকে নিহত করিল। তখন অবশিষ্ট ভ্রাতা সহায়হীন, বিপন্ন ও একক

হইয়া পুনরায় নূতন বাসস্থানের সন্ধানে বাহির হইলেন। উত্তর মুখে অগ্রসর হইতে হইতে তিনি বসিরহাট হইতে প্রায় আট মাইল দূরবর্ত্তী ধান্যকুড়িয়া গ্রামে উপস্থিত হন। এই ধান্যকুড়িয়া গ্রামে সৎচাষী মণ্ডলদিগের বাস ছিল।

একদিন এই মণ্ডল পরিবারের মহিলারা গ্রামের বড় পুকুর নামে একটি পুকুরে স্নান করিতে আসিয়া দেখেন, কয়েকটি অপরিচিত স্ত্রী-পুরুষ পুকুরের পাড়ে রন্ধনের আয়োজন করিতেছে। বলা বাহুল্য, এই অপরিচিত পরিবারটি আমাদের উল্লিখিত বিপন্ন সাউ পরিবার। মহিলারা একটি ছোট মেয়েকে দিয়া এই অপরিচিত মহিলাদের দু'-একজনকে ডাকাইয়া তাঁহাদের বিষয় কিছু জানিয়া লইলেন এবং বাড়ীর কর্ত্তাদিগকে ব্যাপারটা অবগত করাইলেন। কর্ত্তারা পুকুর-পাড়ে আসিয়া সাউ পরিবারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কে? কোথা থেকে আস্‌ছেন? আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় না নিয়ে এমন কষ্ট কর্‌ছেন কেন?"

উত্তরে সাউ পরিবার বলিলেন—"আমরা পথিকমাত্র, পথই আমাদের সম্বল। আমরা আজকার মত এইখানেই খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার অন্য স্থানে চ'লে যাব।"

মণ্ডল কর্ত্তারা বলিলেন—"আপনারা আমাদের গ্রামের অতিথি, আমরা এ গ্রামের মণ্ডল, আমাদের বাড়ীতে এসে আহারাদি করতে হ'বে।"

ইহার পরেই এই অভ্যাগত পরিবারকে মণ্ডলগণ নিজ আলয়ে লইয়া আসিলেন এবং যথারীতি আহারাদি করাইলেন।

আহারাদির পরে মণ্ডল কর্ত্তারা প্রশ্ন-পরম্পরায় জানিতে পারিলেন যে, এই ভাগ্যবিড়ম্বিত সাউ পরিবার তাঁহাদেরই স্বজাতীয়। তখন তাঁহারা সাদরে সাউ পরিবারকে ধান্য-কুড়িয়া গ্রামের এক স্থানে বসবাসের সুবিধা করিয়া দিলেন।

এই সময়ে সাউ পরিবার সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও সহায়হীন। দুঃখ-দারিদ্র্য যেন তাঁহাদের কাটিতেই চাহে না। দুঃখে-কষ্টে তাঁহাদের অনেক দিন কাটিবার পর এই বংশে এক উদ্যমী ও তেজস্বী সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম পতিতচন্দ্র সাউ। তিনিই উপেন্দ্রনাথের পিতা। আমরা যে যাদবরাম ও মাধবরামের উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে যাদবরামের বংশধর হইতেছেন পতিতচন্দ্র। যাদবরাম পতিতচন্দ্র হইতে পঞ্চম পুরুষ উর্দ্ধে। পতিতচন্দ্র নিজ-গুণে এই সাউ বংশকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন। তারপর তাঁহার পুত্র উপেন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ কর্ম্মশক্তি ও উদার চরিত্র এই সাউ বংশকে সমুজ্জ্বল ও বিখ্যাত করিয়াছে। এই উন্নত অবস্থা পতিতচন্দ্র দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। যাহা হউক, পতিতচন্দ্রের পিতা গোবিন্দচন্দ্র প্রথমে গ্রামে ধানের ব্যবসা করেন। পতিতচন্দ্র এই পিতৃ-ব্যবসায়ই চালাইতে

থাকেন এবং বাহুড়িয়া গ্রামে একটি দোকান করেন। কিছু-দিন পরে আপনাদের ব্যবসায়ের প্রসার করিবার মানসে তিনি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। গ্রাম হইতে ইনি তুলা, মটর, ছোলা, গম, তিসি প্রভৃতি দ্রব্যাদি গরুর পৃষ্ঠে চাপাইয়া কলিকাতায় লইয়া আসিতেন ও বিক্রয় করিতেন। তখন ধান্যকুড়িয়া হইতে কলিকাতায় আসিতে হইলে নৌকা-যোগে কিম্বা পায়ে হাঁটিয়া আসা ভিন্ন অন্য কোন উপায় ছিল না। এই উভয় পথেই চোর বা দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠনের ভয়ও অশেষ ছিল। ব্যবসায়ের উন্নতি কামনায় তিনি শারীরিক কষ্ট বা দস্যু-ভয় কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না।

পতিতচন্দ্র এই ব্যবসায়ে কিঞ্চিৎ লাভবান হইলে কলিকাতায় দর্মাহাটা ষ্ট্রীটে (বড়তলা) একখানি ছোট দোকান করেন। এইরূপে দরিদ্র পতিতচন্দ্র ভাগ্য পরি-বর্ত্তনের আশায় যে অধ্যবসায় অবলম্বন করিলেন, তাহা একদিন প্রচুর সুফল প্রসব করিল।

পিতা ও মাতা

পিতামাতার বহু সৎগুণ যে সন্তানের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া থাকে, ইহা জানা কথা। উপেন্দ্রনাথের পিতা ও মাতা তুইজনেরই জীবন এমন ছিল যে, তাহার পরিচয় সাধারণের নিকট দিবার সম্পূর্ণ যোগ্য। পিতা পতিতচন্দ্র সাদাসিধা গৌরবর্ণ সুপুরুষ ছিলেন। পিতৃপিতামহের দারিদ্র্যের মধ্যে এবং অশিক্ষিত সমাজের আবেষ্টনে তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হইলেও, তাঁহার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য তিনি হারাইয়া ফেলেন নাই। সে বৈশিষ্ট্য হইতেছে—পরিশ্রম, অধ্যবসায়, তেজস্বিতা ও সাধুতা।

পিতৃপিতামহের দারিদ্র্য দূর করিয়া আপনাদের উন্নতি সাধন করিবাব দৃঢ় সঙ্কল্প বাল্যকালেই পতিতচন্দ্রের মনে জাগ্রত হয়। আত্মশক্তি অবলম্বন করিয়া তিনি ব্যবসায়ের সাধনায় নিযুক্ত হইলেন। তখনও তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত প্রতিকূল। কিন্তু এই প্রতিকূলতা তাঁহাকে নিরস্ত বা নিরুৎসাহ করিতে পারিল না। ১২৪৯ সালে তিনি সামান্য কিছু মূলধন সংগ্রহ করিলেন এবং কলিকাতায় দেশী চিনি, তিসি ও পাটের ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। তখন পাটের ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা ছিল না বলিলেই চলে এবং দেশী চিনি ও তিসি বিদেশে

রপ্তানি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং পতিতচন্দ্র এই ব্যবসায়ে ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন।

ধান্যকুড়িয়া গ্রামে তখন পতিতচন্দ্রের স্বজাতীর গোবিন্দ-চন্দ্র গাইন মহাশয় বাস করিতেন। তিনি পতিতচন্দ্রের কর্ম্মশক্তিতে মুগ্ধ হইয়া ব্যবসায়ে তাঁহার সহযোগী হইলেন। উভয়ের সম্মিলিত মূলধনে ও প্রচেষ্টায় ব্যবসা প্রসারিত হইতে লাগিল। সাউ পরিবারের সহিত গাইন পরিবারের এই মিলন বা ঐক্যসাধন এই অঞ্চলের প্রভূত মঙ্গলের কারণ হইয়াছে। আবার পতিতচন্দ্রের জামাতা শ্যামাচরণ বল্লভ মহাশয় এই দুই পরিবারের কর্ম্মসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনিও ইঁহাদের সম্পদ অর্জ্জনে ও কল্যাণ সাধনায় যে শক্তি প্রয়োগ করেন তাহা অনন্যসাধারণ বলা যাইতে পারে। সুতরাং, সাউ পরিবারের উন্নতিকাহিনীর সহিত গাইন ও বল্লভ পরিবারের উন্নতিকাহিনী অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বহুবিধ সৎকর্ম্মেও এই তিনটি পরিবার একযোগে কার্য্য করিয়াছেন।

যাহা হউক, পতিতচন্দ্রের ব্যবসায় দিনের পর দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। ইহা ছাড়া তেজারতী কার্য্যেও তাঁহার অর্থাগম হইল। পতিতচন্দ্র অর্থ সঞ্চয় করিলেন। পতিতচন্দ্র ধনী হইলেন। স্বগ্রামত্যাগী, আশ্রয়হীন ও অন্নহীন যাদব-রাম ও মাধবরামের আত্মা স্বর্গ হইতে পতিতচন্দ্রের ভাগ্যোজ্জ্বল প্রসন্ন ললাট নিরীক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ

করিল। পতিতচন্দ্র আড়বেলিয়ার জমিদারদের নিকট হইতে বাসগ্রাম ধান্যকুড়িয়া কিনিয়া লইলেন।

পতিতচন্দ্রের নানাবিধ সৎগুণ ছিল। যখন তিনি অর্থের অধিকারী হইলেন তখনও তিনি পূর্ব্বেকার মত সাদাসিধা পোষাক ও সরল আচরণ ত্যাগ করেন নাই। সকলের সহিত মেলামেশা করা ও পরের দুঃখে সহায়তা করা তাঁহার স্বাভাবিক কার্য্য ছিল। তিনি কলিকাতা হইতে যখনই গ্রামে যাইতেন, সঙ্গে সাগু, মিছরি, বেদানা প্রভৃতি এবং গ্রামে দুষ্প্রাপ্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি বহুল পরিমাণে লইয়া যাইতেন। পাড়া-পড়শীদের খোঁজ লওয়ার সময় সেইসব দ্রব্য আবশ্যক অনুসারে বিতরণ করিতেন। জনসাধারণকে খাওয়াইয়া পরিতুষ্ট করা তাঁহার এক প্রিয় কার্য্য ছিল। তিনি কলিকাতা হইতে গ্রামে গেলে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ রাধাকান্তের শ্রীমন্দিরে ও তাঁহার বাটীতে বহু জন-সমাগম হইত। তখন পতিতচন্দ্র তাঁহাদিগকে এবং প্রজা, খাতক প্রভৃতিকে না খাওয়াইয়া ছাড়িতেন না।

তিনি গ্রামের ঝগড়া-বিবাদ আদালত অবধি গড়াইতে দিতেন না। নিজের তত্ত্বাবধানে গ্রামেই তাহা আপোষে মিটাইয়া ফেলিতেন। নিজের সম্বন্ধেও মামলা-মোকদ্দমা করা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। একবার এক জমিদারী ক্রয়কালে কোন বিশিষ্ট জমিদারবাবুদিগের সহিত এক জটিল মোকদ্দমায় তিনি বাধ্য হইয়া জড়িত হইয়া পড়েন।

কিছুদিন মোকদ্দমা চলিবার পর জজকোর্টে তিনি জয়লাভ করেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিপক্ষ জমিদারগণ ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহারা হাইকোর্টে মামলাটি রুজু করিলেন। পতিতচন্দ্র মামলাটিতে জয়ী থাকিলেও হঠাৎ একদিন প্রতি-পক্ষগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"মামলায় আমি জয়ী থাক্‌লেও, আমি ইচ্ছা করি না যে, মাম্‌লাটা আবার ঘোরতর হ'য়ে চল্‌তে থাকুক। আপনারা মামলা মিটিয়ে নিন। আমি সামান্য ব্যবসাদার লোক। মোকদ্দমায় জেদাজেদি ক'রে অর্থ অপব্যয় করা ভাল মনে করি না।"

বিপক্ষ জমিদার বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"আপনি তো জয়ী আছেন,—তবে এ অনুরোধ কেন?"

পতিতচন্দ্র উত্তরে বলিলেন—"মামলা আমি পছন্দ করি না। আসুন আপোষে মীমাংসা ক'রে নি। যে জমি নিয়ে বিবাদ, আসুন তা আমি খানিকটা নিই আর আপনারা খানিকটা নিন।"

প্রতিপক্ষ দল এই সরল প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মামলা আপোষে মিটিয়া গেল। দুইটি বড় পরিবার সর্ব্বনাশা মোকদ্দমার হাত হইতে রক্ষা পাইল।

তাঁহার গ্রামবাসীগণ স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করুক, ইহা পতিতচন্দ্রের বাসনা ছিল। তিনি প্রায় প্রত্যেক গ্রাম-বাসীকে ব্যবসা করিবার জন্য মূলধন দিয়া সাহায্য করিতেন। পতিতচন্দ্র কলিকাতায় দেশী চিনির ব্যবসা করিতেন বলিয়া

দেশে তাঁহার সহায়ক ছোট ছোট চিনির কারখানা আপনার আগ্রহে প্রায় প্রত্যেক গ্রামবাসীর গৃহে স্থাপন করাইয়াছিলেন। তাহাদের নিকট হইতে তিনি চিনি কিনিয়া লইতেন। এই কারখানাগুলি যখন পূরাদমে চলিতেছে, তখন একবার ইন্‌কম্ ট্যাক্সের এসেসর মহাশয় ধান্যকুড়িয়ায় গিয়া উপস্থিত হন। তিনি প্রত্যেক কারখানার খাতাপত্র পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। গ্রামবাসীগণ পতিতচন্দ্রের নিকট এই সংবাদ জানাইল। পতিতচন্দ্র এই কথা জানিতে পারিয়া গ্রামে আসিলেন এবং ব্যবসায়ীগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন—"তোমাদের এই সব ছোট ছোট ব্যবসায় যা সামান্য মুনফা হয় তার ওপর ইন্‌কম্ ট্যাক্স দেওয়া তোমাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর হ'বে, বুঝ্‌তে পার্‌ছি। যা হোক, এসেসর মশাই যা ট্যাক্‌স্ ধার্য্য কর্‌বেন তার জন্যে তোমরা ভাব্‌বে না। আমি তোমাদের ঐ ট্যাক্‌স্ দেব, তোমরা এসেসরকে দিও।"

ব্যবসায়ীগণ তাহাই করিলেন। পতিতচন্দ্রের উদারতায় অনেকগুলি গরীব ব্যবসায়ী ব্যক্তি রক্ষা পাইল।

পতিতচন্দ্র ধর্ম্মপরায়ণ বৈষ্ণব ছিলেন।

উপেন্দ্রনাথের মাতা শ্যামাসুন্দরী পতিতচন্দ্রের যোগ্য সহধর্ম্মিণী ছিলেন। সেকালের পল্লী-রমণীদের যে শ্রম ও রন্ধনপ্রিয়তা, এই দুই গুণই শ্যামাসুন্দরীর ছিল। উপরন্তু তিনি ধনীর গৃহিণী হইয়াও সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিশিতেই

ভাল বাসিতেন। স্বামীর ন্যায় তিনি অতিথি-বৎসলা ও পরোপকারিণী ছিলেন। পাড়া-পড়শীর গৃহে যে-কোন মাঙ্গলিক কার্য্য ঘটিলে তিনি নিজে উপস্থিত হইয়া তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন। যদি এইরূপ কার্য্যে কোনো গৃহস্থের কোনো দ্রব্যাদি বা অর্থের অভাব হইত, তবে তিনি সঙ্গে-সঙ্গে নিজ গৃহ হইতে তাহা সরবরাহ করিতেন। নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া ভিক্ষুককে আহার করানো তাঁহার আনন্দের কার্য্য ছিল; জমীদার-পত্নী হইয়াও পাচক রাখিয়া বাড়ীর রন্ধন কার্য্য করানো একেবারে পছন্দ করিতেন না। স্বহস্তে রন্ধন করাই তাঁহার রীতি ছিল। কন্যাদায়গ্রস্তকে অর্থদান তাঁহার স্বাভাবিক কার্য্য ছিল। তিনি মৃত্যুকালে নিজের সঞ্চিত বারো হাজার টাকা তাঁহার পুত্রের প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়ে দান করিয়া যান।

শ্যামাসুন্দরী অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা নারী ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি তীর্থ করিতে পুরীধামে যাইবার জন্য অভিলাষী হন। কিন্তু পুত্র উপেন্দ্রনাথ তখনকার দুর্গম পথে জননীর জীবন বিপন্ন হইতে পারে এই আশঙ্কায় জননীকে তীর্থে যাইতে দিতে অসম্মত হন। কিন্তু শ্যামাসুন্দরীর আগ্রহ এত প্রবল ছিল যে, শেষ পর্য্যন্ত পুত্রকে সম্মত হইতে হইল। শ্যামাসুন্দরী কয়েকজন গ্রামবাসী নর-নারীকে সঙ্গে লইয়া তীর্থে গমন করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় বা হিন্দুর চক্ষে পুণ্যের বিষয় এই যে, তীর্থ-পথে মহানদীর শাখা বিরূপা নদীর

নিকটে বারণ নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে ১৩০৬ সালের আষাঢ় মাসে উপেন্দ্রনাথের পুণ্যবতী জননী শ্যামাসুন্দরী পরলোক গমন করেন।

আমরা দেখিতে পাইলাম, উপেন্দ্রনাথের পিতা ও মাতা উভয়েই সৎস্বভাব, সরল, পরিশ্রমী ও পরোপকারী ছিলেন। পুত্র উপেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রকৃতির বহু উপাদান পিতামাতার প্রকৃতি হইতে আহরণ করিয়াছিলেন।

বাল্যকাল

১২৬৫ সালের ৫ই মাঘ (ইং ১৬ই জানুয়ারী, ১৮৫৯) উপেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে দেশের অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, সিপাহী বিদ্রোহের আলোড়ন তখন সবেমাত্র স্তব্ধ হইয়াছে; বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনে ও সমাজ-সংস্কারে অগ্রণী হইয়াছেন; সাহিত্যে তাঁহার গদ্য রচনা ও মাইকেল মধুসূদনের বাঙ্গলা নবকাব্য-সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে; রাজনীতিক্ষেত্রে আনন্দমোহনের নির্ভীক কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে; এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রামতনু লাহিড়ী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি হিন্দুর ধর্ম্মের ও সমাজের নব মূর্ত্তি চিত্রিত করিতেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ বাঙ্গালীর সর্ব্ববিধ জাগরণের, দেশাত্মবোধের বা আত্মপ্রকাশের এক অপূর্ব্ব সূচনাকাল। এই যুগসন্ধিক্ষণেই উপেন্দ্রনাথের জন্ম। তিনি স্বীয় প্রতিভাবলেই যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে নবযুগ গঠনের উপযোগী। তাঁহার ব্যবসায়ে উন্নতিসাধন এবং পল্লীর মঙ্গল-সাধন, এই দুই কার্য্যই নবজাগ্রত বাঙ্গালীর জীবন গঠনের সম্পূর্ণ সহায়ক। সুতরাং উপেন্দ্রনাথের নাম বাঙ্গালীর জাতীয়তার ইতিহাসের সঙ্গে উল্লিখিত হইবার যোগ্য। তাঁহার জীবনের

কার্য্য একটা খাপছাড়া ব্যাপার নহে; বাঙ্গালী জাতির জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে তাহার সঙ্গতি রহিয়াছে।

উপেন্দ্রনাথের এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন, তাঁহার নাম দাক্ষায়ণী। উপেন্দ্রনাথ তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন; তাঁহার কথা কখনও অমান্য করিতেন না।

উপেন্দ্রনাথ শৈশব হইতে কিছু গম্ভীর প্রকৃতির বালক ছিলেন। কখনও চপলতা করিতেন না। ছেলেবেলায় শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তির পুতুল লইয়া খেলা করিতে ভালবাসিতেন। বাড়ীর মেয়েরা তরকারী কুটিলে মোচার খোলা ও থোড়ের চাক্‌তি লইয়া রথ তৈয়ারী করিতেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—"আমি কৃষ্ণের রথ কর্‌ছি।"

তাঁহার স্বভাব খুব জেদী ছিল। কোন কাজ আরম্ভ করিলে তাহা শেষ না করিয়া ছাড়িতেন না।

গ্রামের পাঠশালায় উপেন্দ্রনাথের লেখাপড়া আরম্ভ হয়। তখনকার গুরুমহাশয়দের পড়াইবার যে পদ্ধতি ছিল সেই অনুসারেই তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি লেখাপড়ায় সকল ছাত্রের অগ্রণী ছিলেন বলিয়া সর্দ্দার পোড়ো হন।

তাঁহার সমপাঠীরা অনেকেই দরিদ্র কৃষকের সন্তান ছিল। পোষাকে বা ব্যবহারে তাহাদের সহিত উপেন্দ্রনাথের কোনই প্রভেদ ছিল না। তাঁহার মন যেমন সরল ছিল, স্বাস্থ্যও তেমনি সুন্দর ছিল। সন্তরণ তাঁহার এক প্রিয় ব্যায়াম ছিল। পায়ে হাঁটিয়া তিনি অনেক দূর বেড়াইতেও

ভালবাসিতেন। দেখিতে তিনি গৌরবর্ণ ও সুন্দর ছিলেন। শারীরিক বলও তাঁহার ভালই ছিল। তাঁহার বাল্যকালের একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। একবার তাঁহাদের বাটীতে একটি ঘরে রাত্রিতে মশারিতে আগুন লাগিয়া যায়। উপেন্দ্রনাথ তাহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি গিয়া দেখেন, ঘরের দরজা বন্ধ। দরজা খুলিবার উপায় করিতে বিলম্ব হইবে ভাবিয়া তিনি সঙ্গে-সঙ্গে একটা জানালার লোহার গরাদ দুই হাতে প্রবল বলে টানিয়া তাহা ফাঁক করিয়া দেন এবং ঘরে প্রবেশ করিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করেন।

তাঁহাদের গ্রামের শিবতলায় রাসযাত্রা উৎসব প্রতি বৎসর সম্পন্ন হইত। ইহা গ্রামবাসীদের প্রাণের উৎসব ছিল। উপেন্দ্রনাথ সকল বালকের সহিত মিশিয়া সেখানে বাঁশ কাটা, ম্যারাপ বাঁধা, সাজানো-গোছানো ইত্যাদি কাজ আনন্দের সহিত করিতেন। ধনীর সন্তান বলিয়া নিজে দূরে থাকিতেন না।

তিনি যখন গ্রামের পাঠশালায় পড়িতেছেন, তখন তাঁহার পিতা মাঝে মাঝে কলিকাতা হইতে বাটী আসিয়া কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত বহু ইংরেজী স্কুলের উচ্চ শিক্ষার কথা তাঁহাকে শুনাইতেন। ইহা শুনিতে শুনিতে উপেন্দ্রনাথের মন সেই শিক্ষালাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত। ফলে এই দাঁড়াইল যে, পাঠশালার পাঠ সমাপ্তির পর তাঁহার পিতা তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া ফ্রী চার্চ্চ ইনষ্টিটিউশনে ভর্ত্তি করিয়া

দিলেন। বিখ্যাত খৃষ্টধর্ম্ম-যাজক ও শিক্ষাদাতা আলেক্‌জাণ্ডার ডাফ্‌ এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তখনও কলিকাতায় অধিকসংখ্যক ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। সুতরাং খৃষ্টান পাদ্রীরা শিক্ষাপ্রচার ও ধর্ম্মপ্রচারের আদর্শ সম্মিলিত করিয়া যে-সব বিদ্যালয় পরিচালিত করিতেন, সেইগুলিতে বহু হিন্দু ছাত্র শিক্ষালাভের জন্য যাইত।

এই বিদ্যালয়ে উপেন্দ্রনাথ ইংরেজী শিক্ষায় অসাধারণ উৎসাহ দেখাইতে লাগিলেন। ইতিহাস ও ভূগোল পড়িতে তিনি খুব ভালবাসিতেন, বিশেষ করিয়া ইতিহাস। ইংরেজী শিক্ষার মর্ম্মকথা যে স্বদেশ-প্রেম ও পার্থিব উন্নতিসাধন, তাহা তাঁহার মনকে অধিকার করিল। দেশের উন্নতিসাধনে শিক্ষার যে কত প্রয়োজন, তাহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিলেন। সেই জন্য যখনই তিনি কলিকাতা হইতে গ্রামে যাইতেন তখনই পাঠশালায় যাইয়া ছাত্রদিগকে বিশেষ আনন্দের সহিত পড়াইতেন; কলিকাতায় শিক্ষার উন্নতির কথা তাহাদিগকে বলিতেন এবং উপযুক্ত ছাত্রগণকে পুস্তকাদি উপহার দিয়া উৎসাহিত করিতেন।

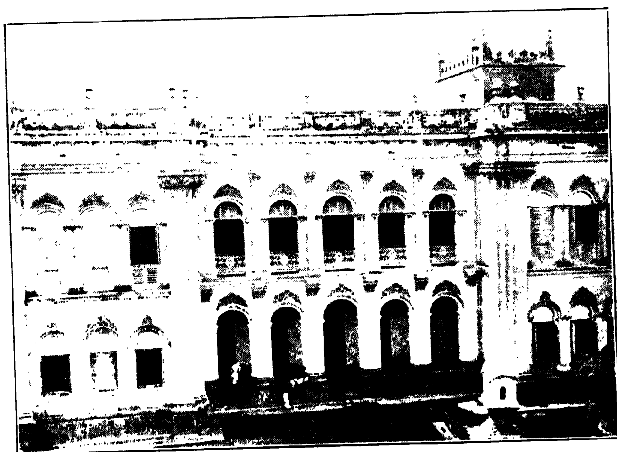
এই সময়ে তাঁহার অভিলাষ হইল,—নিজের গ্রামের বালকদিগের শিক্ষার জন্য একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। তিনি এ বিষয়ে তাঁহার পিতাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতার ব্যবসায় তখন খুব বড় হয় নাই বলিয়া, তিনি গ্রামে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থাপন করিতে সাহস করিলেন না। তাহা ছাড়া তখনও এ দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের অনুকূল হইয়া উঠে নাই। এজন্য তাঁহার পিতা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অবশেষে উপেন্দ্রনাথের প্রবল আগ্রহে তাঁহার পিতা কতকটা সম্মত হইলেন। তিনি পুত্রের অভিলাষ অনুসারে কার্য্য করিতে উদ্যোগী হইলেন। ব্যবসায়ে তাঁহার অংশীদারগণ এই বিষয়ে তাঁহার সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন এবং গ্রামবাসীগণ এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। অবশেষে বসিরহাট মহকুমার সাব্ডিভিসনাল অফিসার সীতাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য উপেন্দ্রনাথ এক সভার আয়োজন করিলেন। এই সভায় তিনি শিক্ষা-প্রচারের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন। তাহার পর ধান্যকুড়িয়ায় মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই ভবিষ্যতের বৃহৎ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্বরূপ বলা যাইতে পারে।

উপেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়া একদিকে যেমন শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহী হইয়া উঠিলেন, অপরদিকে তেমনি কলিকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি দেখিয়া ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিতে অভিলাষী হইতে লাগিলেন। কলিকাতার কর্ম্মকোলাহল, পণ্যদ্রব্যবাহী অসংখ্য জলযান, ব্যবসা-বাণিজ্যের অতুল উন্নতি এবং দূরত্ববিলোপকারী বাষ্পীয় যানের ঘন ঘন যাতায়াত তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। তিনি বুঝিলেন,



ধান্যকুড়িয়া চতুষ্পাঠী



উপেন্দ্রনাথের বাসভবন ধান্যকুড়িয়া

এ সমস্তই বিদ্যার ফল। তাঁহার দেশবাসী বিদ্যা-লাভ করিতে পারিলে এই সব উন্নতির অধিকারী হইতে পারিবে। তাঁহাদের গ্রামের মধ্যে তাঁহাদেরই আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত যে-সব চিনির কারখানা ছিল, তাহার মালিকেরা যখনই কলিকাতায় যাইতেন, উপেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে কলিকাতার উন্নতির কথা বারংবার বলিতেন এবং তাঁহাদের সন্তানদিগকে এ বিষয়ে উৎসাহী হইতে বলিতেন।

এইখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, দেশের কল্যাণকর যে দুইটি কার্য্যে তিনি পরিণত বয়সে আত্মনিয়োগ করেন, তাহার প্রতি অনুরাগ বাল্যকালেই তাঁহার মনে জাগ্রত হইয়াছিল। এই দুইটি কার্য্য হইতেছে, পল্লীর সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন ও ব্যবসায়ে কৃতিত্ব অর্জ্জন। এই দুইটি কাজই তখনকার বাঙ্গালীর জীবনে, শুধু তখনকার কেন এখনকারও বটে, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সময়ে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের বহুবিধ উন্নতির সূচনা হয়। বাঙ্গালীর সেই নব জাগরণের তরঙ্গ যে উপেন্দ্র-নাথের হৃদয়ে আঘাত করিতেছিল, তাহারই আভাস তাঁহার বাল্যকালীন কার্য্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েকটি বিখ্যাত নেতৃস্থানীয় বাঙ্গালী উপেন্দ্রনাথের সমপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা হইতেছেন—অনারেব্‌ল্ ভূপেন্দ্রনাথ বসু, রায় বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু, সার্ নীলরতন সরকার, মহারাজা মণীন্দ্র-চন্দ্র নন্দী, ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষ প্রভৃতি।

যৌবনে গ্রামের সেবা—বিবিধ কার্য্য

বড়ই দুঃখের বিষয়—এই শিক্ষানুরাগী সৎ ছাত্রকে অল্প বয়সেই বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হইল। পতিতচন্দ্র ব্যবসায়ে প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়া, স্বোপার্জ্জিত অর্থে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছেন, এমন সময় ১২৮৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। পুত্র উপেন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র উনিশ বৎসর। উপেন্দ্রনাথকে বিদ্যাশিক্ষা বন্ধ করিয়া নিজ জমিদারীর তত্ত্বাবধান করিবার জন্য গ্রামে আসিতে হইল। তখন তিনি কিশোর কাল অতিক্রম করিয়া মাত্র যৌবনে পদার্পণ করিতেছেন। বিদ্যাশিক্ষার জন্য তখন তাঁহার মন-প্রাণ উন্মুখ। এই দৈব বিড়ম্বনায় তাঁহার আশা-আকাঙ্ক্ষা ম্লান হইল বটে, কিন্তু তাহা নবতর পরিণতির পথে ধাবিত হইল। নিজ গ্রামকে সর্ব্বদিক হইতে সমুন্নত করার যে কার্য্যে তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন, তাহাতে তাঁহার ব্যাকুল হৃদয় যেন একটা আশ্রয় লাভ করিল। ইহা মনে রাখা দরকার যে, বিদ্যার্জ্জনের আগ্রহ তাঁহার অন্তরের মধ্যে সমান ভাবেই জাগ্রত রহিল। সংসারের নানা কর্ম্মের মধ্যে নিবিষ্ট হইলেও, তিনি অবকাশ ও অনুরাগমত, বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়া জ্ঞান লাভ করেন। তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

উপেন্দ্রনাথ বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া গ্রামে আসিলেন। তাঁহাদের কলিকাতার ব্যবসায়ের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিলেন অংশীদার গাইন্ বাবুরা ও উপেন্দ্রনাথের ভগ্নীপতি শ্যামাচরণ বল্লভ মহাশয়। এই শ্যামাচরণ অত্যন্ত দরিদ্র ঘরের সন্তান ছিলেন। বাল্যকালে তিনি পতিতচন্দ্রের ও গোবিন্দচন্দ্রের দোকানের কার্য্যাদি দেখাশুনা করিতেন। শ্যামাচরণ বাল্যকাল হইতেই তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী ছিলেন। পতিতবাবু শ্যামাচরণের প্রতিভা দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁহাকে নিজ পুত্রের ন্যায় স্নেহ ও যত্ন করিতেন এবং তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রের উপযোগী করিবার জন্য নানাবিধ উপদেশ ও শিক্ষা দিতেন। পরে তিনি নিজের একমাত্র কন্যা দাক্ষায়ণীর সহিত শ্যামাচরণের বিবাহ দেন এবং ব্যবসায়ে তাঁহাকে অংশী করিয়া লন। শ্যামাচরণ পতিতচন্দ্রকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন। পতিতচন্দ্রের উদারতা ও সাহায্যের কথা তিনি জীবনে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের গুণে ব্যবসায়-কার্য্য চরম উন্নতি লাভ করে। পরবর্ত্তী-কালে শ্যামাচরণ যেরূপ প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন, তেমনি অর্থের সদ্ব্যয়ও করিয়া গিয়াছেন। শ্যামাচরণ দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন। তিনি এত বেশী দান করিতেন যে, দেশের ঘরে ঘরে তাঁহার দানের কথা এখনও প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়া রহিয়াছে।

যাহা হউক, উপেন্দ্রনাথ যখন গ্রামে আসিয়া বসিলেন,

তখন গাইন্ বাবুরা ও শ্যামাচরণ বাবু তাঁহাদের ব্যবসা পরিচালন করিতে লাগিলেন। উপেন্দ্রনাথ তাঁহার বুদ্ধি ও শক্তি গ্রামের সেবায় নিয়োগ করিলেন। এই স্থানে একথা বলা দরকার যে, উপেন্দ্রনাথ যখন গ্রামের কাজে নিযুক্ত রহিলেন, তখন তাঁহাদের কলিকাতার ব্যবসার সহিত তাঁহার যোগ একেবারে ছিন্ন হয় নাই। গ্রামের কাজ ও ব্যবসায়ে উন্নতি প্রায় সমসাময়িক। এক সঙ্গে তাহার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব বলিয়া আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সে কথা বলিব।

গ্রামের সেবা বা পল্লী-সংস্কার বা পল্লী-সংগঠন শব্দের সহিত আমরা আধুনিক কালে সুপরিচিত। কংগ্রেস যে সময় হইতে মহাত্মা গান্ধীর অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, সেই সময় হইতে অগ্নিময় রাজনীতি-চর্চ্চার সঙ্গে-সঙ্গে ভারতের অনাদৃত গ্রামগুলির বেদনা পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা বর্ত্তমান জগতের মানব-প্রধান মহাত্মা গান্ধীর এক মহান্ আশীর্ব্বাদ। ভারতের আর একটি মনীষী স্বদেশকে গ্রাম-সেবার এই আদর্শ দান করিয়াছেন। তিনি হইতেছেন বর্ত্তমান জগতের কবিকুলতিলক রবীন্দ্রনাথ। এই দুই মনীষীর অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি ইংরেজী-শিক্ষিত ভারতবাসীর স্বদেশ-বিমুখ চিত্তকে স্বদেশের কেন্দ্রস্থানীয় গ্রামগুলির প্রতি নিবদ্ধ করিয়াছে। এই পল্লীরক্ষা বা গ্রাম-সেবার কাজগুলি যে কি কি, তাহা আমাদের অবিদিত নাই—

(১) রাস্তা গঠন ও সংস্কার।
(২) জলনিকাশের সুব্যবস্থা।
(৩) জলাশয় খনন।
(৪) বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
(৫) চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা।
(৬) পূজা, উৎসব ও কথকতা দ্বারা লোক-শিক্ষা।
(৭) বিবাদের আপোষ-নিষ্পত্তি।
(৮) গ্রামবাসীর অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন।

একটি গ্রামে বসিয়া এই কাজগুলি যদি সুভাবে করা যায়, তবে সেই গ্রামকে আদর্শ গ্রামে পরিণত করা অসম্ভব নয়। উপেন্দ্রনাথ এই কার্য্যগুলি কি ভাবে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহাই এখন আমাদের দেখিবার বিষয়। সাধারণতঃ অর্থের অভাবে গ্রাম-সংস্কার-কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। উপেন্দ্রনাথের সে অভাব ছিল না। তাহার উপর তাঁহার আগ্রহেরও অভাব ছিল না। আপনাদের বিষয়-সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি গ্রামোন্নতির কাজ করিতে লাগিলেন।

উপেন্দ্রনাথ প্রথমেই ধান্যকুড়িয়ার রাস্তাগুলির সংস্কার করিলেন—কোনটি মেরামত, কোনটি বা পাকা করিয়া দিলেন। সাধারণতঃ গ্রামের নিয়ম এই যে, গ্রামে বিবাহ-কার্য্য ঘটিলে জমীদারের সম্মানের জন্য জমীদারকে কিছু কিছু অর্থ দেওয়া হইয়া থাকে। উপেন্দ্রনাথ এই ভাবে সংগৃহীত অর্থ নিজে কিছুমাত্র গ্রহণ না করিয়া সেই অর্থের সহিত

নিজের অর্থ দান করিয়া গ্রামের প্রধান রাস্তাটি পাকা করিয়া দেন। পরে গাইন্ ও বল্লভ বাবুদিগের সহযোগিতায় গ্রামের সমুদয় রাস্তাই পাকা ও উন্নত করেন। গ্রামের প্রধান রাস্তাটি বর্ত্তমানে তাঁহার পিতা পতিতচন্দ্রের স্মরণার্থে পতিতচন্দ্র সাউ রোড নামে চব্বিশ পরগণা জেলা-বোর্ড কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছে। ধান্যকুড়িয়া হইতে বাদুড়িয়া যাইবার পথের মধ্যে একটি বিল ও খাল আছে। উপেন্দ্রনাথ বহু অর্থ ব্যয়ে ঐ খালের উপর একটি প্রশস্ত সেতু তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। আরও দুই একটি রাস্তা পাকা করিতে আরম্ভ করিয়া, জমীর মালিকদিগের বাধা-বিপত্তিতে তিনি সে কার্য্য শেষ করিতে পারেন নাই। গ্রামে বর্ষার জল যাহাতে সুভাবে বাহির হইয়া যায়, সেদিকেও তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। এই প্রসঙ্গে একটি কৌতুককর ঘটনা আছে। তাঁহার একখানি বাড়ী তৈয়ারী হইবার প্রথম অবস্থায় তিনি গ্রামে ছিলেন না। গ্রামে যেদিন আসিলেন, সেদিন দেখিলেন যে, গ্রামের জলনিকাশের খানার উপর তাঁহার বাড়ী তৈয়ারী হইতেছে। ইহাতে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত কাজ বন্ধ করিয়া দেন এবং বলেন—"আমি কি নিজের সুখের জন্য গ্রামের সর্ব্বনাশ কর্‌ব ? গ্রামের জলনিকাশের পথ আমি বন্ধ কর্‌ব কেন ?"

পরে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে বুঝাইয়া বলেন, জলনিকাশের পথ অনায়াসেই অন্য দিকে করা যাইতে পারে ;

সুতরাং তাঁহার বাড়ী উঠাইতে বাধা নাই। কিন্তু তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট হন নাই; বরং গ্রামের কর্তৃস্থানীয় কয়েক জনকে ডাকাইয়া তিনি তাহাদের মতামত জানিতে চাহেন। তাঁহারা যখন বিশেষভাবে বুঝাইয়া বলেন যে, স্থানান্তরে জল-নিকাশের পথ করিয়া দিলে কোন ক্ষতি হইবে না, তখন তিনি বাড়ী সমাপ্ত করিতে সম্মত হন। গ্রামবাসীর সুবিধা ও স্বাস্থ্যের দিকে তাঁহার এতই লক্ষ্য ছিল। গ্রামবাসীদের মধ্যে কোন ঝগড়া-বিবাদ উপস্থিত হইলে, উপেন্দ্রনাথ তাঁহার পিতার মত সেগুলি নিজের তত্ত্বাবধানে আপোষে মিটাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। তাহাতে গ্রামবাসীদের অনেক রেষারেষি, হিংসা ও অনর্থক অর্থব্যয় ঘটিতে পারিত না। তাঁহার বিচার এতই বিচক্ষণ হইত যে, গ্রামবাসীরা তাঁহাকে সূক্ষ্ম বিচারক বলিয়া গণ্য করিত।

সুপেয় জলের জন্যও তিনি গ্রামে অনেকগুলি বড় বড় পুকুর কাটাইয়া দিয়াছিলেন।

গ্রামের সেবা—শিক্ষা বিস্তার

গ্রামোন্নতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কাজ যে বিদ্যা বিতরণ, তাহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বাল্যকালেই এ চিন্তা তাঁহার মনে জাগ্রত হয় বলিয়া, তিনি পিতাকে সবিশেষ অনুরোধ করিয়া মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করাইয়াছিলেন। সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এইবার উচ্চতর ইংরেজী বিদ্যার আস্বাদে উদ্বুদ্ধ উপেন্দ্রনাথ ইংরেজী বিদ্যার প্রচারে উদ্যোগী হইলেন।

তিনি গ্রামে জনহিতকর যতগুলি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করেন, সবগুলিই নিজ হাতে ও নিজ পরিশ্রমে ক্ষুদ্র আকারে আরম্ভ করিয়া বৃহৎ আকারে উন্নীত করেন। ইহা তাঁহার কার্য্যের এক বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য ধনী ব্যক্তির ন্যায়, কেবল মাত্র অর্থদান করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। নিজ পরিশ্রমে সরল আনন্দে তিনি প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া তোলেন।

তাঁহাদের মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় বেশ ভল ভাবেই চলিতেছে, এমন সময় ঐ অঞ্চলে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। বাদুড়িয়া নামক গ্রামের মিশনারী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ভবনটি আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যায়। সুতরাং ঐ অঞ্চলের

বালকদের উচ্চশিক্ষা দিবার উপায় একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। উপেন্দ্রনাথের উৎসাহী চিত্ত এই ব্যাপারে পথ খুঁজিয়া পাইল। তিনি চব্বিশ পরগণার ডেপুটি ইন্‌স্পেকটর অব্ স্কুলস্, বাবু মতিলাল মৈত্র মহাশয়কে সভাপতি করিয়া, এক সভায় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অভিলাষ জানাইলেন। সভাস্থ সকলেই তাঁহার এই সদিচ্ছার অনুমোদন করিল।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে উপেন্দ্রনাথ ধান্যকুড়িয়ায় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। ক্ষুদ্র গৃহে মাত্র আশী জন ছাত্র লইয়া এই বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্যামাচরণ বল্লভ ও মহেন্দ্রনাথ গাইন্ মহাশয় এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উপেন্দ্র-নাথের সহায় হইয়াছিলেন। সেই সময় এই গ্রাম বর্ত্তমান কালের মত সমৃদ্ধ হইয়া উঠে নাই, অধিকাংশ লোকেরই অবস্থা ভাল ছিল না। ছাত্রদত্ত বেতনের উপর নির্ভর করিয়া স্কুল চালান প্রায় অসম্ভব দেখিয়া, উপেন্দ্রনাথ স্কুলটিকে একরূপ অবৈতনিক বিদ্যালয় করিয়া চালাইতে লাগিলেন। যে-সব ছাত্রের সামর্থ্য ছিল, প্রথম হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত তাহাদের নিকট হইতে আট আনা বেতন এবং নিম্নতর শ্রেণী হইতে চারি আনা মাত্র বেতন লওয়া হইত। অধিকাংশ ছাত্রই বিনা বেতনে পড়িত। স্কুলের সমস্ত ব্যয়ভারই সাউ, বল্লভ ও গাইন্ পরিবারের সম্মিলিত পি. জি এণ্ড ডাব্লু সাউ কোম্পানী বহন করিতেন।

উপেন্দ্রনাথ স্কুলের সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন এবং প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে স্কুলে যাইয়া শিক্ষকতা করিতেন। তাঁহার শিক্ষাদানের বিষয় ছিল ইতিহাস।

এই স্কুলের পার্শ্বেই তিনি একটি বোর্ডিং হাউস বা ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তাহাতে দূর দেশ হইতেও ছাত্রগণ আসিয়া বাস করিত। তিনি সর্ব্বদাই ছাত্রদের সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। অভিভাবকগণ এই ছাত্রাবাসে তাঁহাদের সন্তানগণকে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। তাঁহার বাগান, পুকুর ইত্যাদি ছাত্রদের সম্পূর্ণ অধিকারে ছিল। তাঁহার বাড়ীতেও ছাত্রদিগের অবাধ গতি ছিল এবং সেখানে তাহারা পরম আদরে আহার ও মিষ্টান্ন লাভ করিত। মেধাবী ছাত্র-দিগকে পুরস্কারদানে উৎসাহিত করিতে এবং এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে উচ্চতর শিক্ষালাভে সহায়তা করিতে তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে ও তত্ত্বা-বধানে তাঁহার বিদ্যালয়টি ঐ অঞ্চলে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিল। ছাত্র-সংখ্যা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বিদ্যালয়গৃহে অধিক-সংখ্যক ছাত্রকে স্থান দেওয়া সম্ভব হইল না। তখন গ্রামের মধ্যে একটি সুবিস্তীর্ণ স্থানে, ১৯১২ খৃষ্টাব্দে, লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে স্কুলের নূতন গৃহ ও ছাত্রাবাস নির্ম্মিত হইল। বিদ্যালয়ের সংলগ্ন জমি সুরক্ষিত। তাহার মধ্যে একটি স্বচ্ছ-নীর পুষ্করিণী ও ছাত্রদের খেলিবার মাঠ আছে।

এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য

উপেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহকর্মী বল্লভ ও গাইন্ বাবুরা দুই লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের অসহায় দরিদ্র ছাত্রগণ আপনাদের পাঠ্য পুস্তক, পরীক্ষার জন্য দেয় ফী ও বাসের সুবিধা পাইয়া থাকেন। বহু দরিদ্র ছাত্র তাঁহার সহায়তায় উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কালীধন চন্দ্র নামে একটি ছাত্রের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। উপেন্দ্রনাথ একবার কার্য্য উপলক্ষে বসিরহাট হইতে ধান্যকুড়িয়া গ্রামে ফিরিয়া যাইতেছেন, এমন সময় পথিমধ্যে দেখেন, এক গাছতলায় একটি বালক বিমর্ষ হইয়া বসিয়া আছে। তিনি বেহারাদিগকে তাঁহার পাল্কী রাখিতে বলেন এবং বালকটিকে কাছে ডাকিয়া তাহার পরিচয় লইয়া জানিতে পারেন যে, অর্থাভাবে তাহার বিদ্যাশিক্ষার পথ বন্ধ হওয়ায় সে হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। বালকটির স্বহস্তাঙ্কিত কতকগুলি সুন্দর ছবি তাহার নিকট ছিল। সেগুলি দেখিয়া উপেন্দ্রনাথ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বুঝিতে পারেন যে, চিত্রাঙ্কণ-বিদ্যায় বালকটিকে উৎসাহ দিলে, ভবিষ্যতে সে এ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিবে। উপেন্দ্রনাথ পাল্কী ছাড়িয় বালক কালীধনকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। তারপর বালকটিকে কলিকাতায় পাঠাইয়া গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন এবং তাহার সমস্ত ব্যয়ভার নিজে গ্রহণ করেন। যথাসময়ে এই বালক চিত্রাঙ্কণ-বিদ্যায় বিশেষ

পারদর্শিতা লাভ করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের জিওলজিকাল সার্ভে অফিসে উচ্চপদে নিযুক্ত হন এবং বহু বৎসর বিচক্ষণতার সহিত উক্তপদে কার্য্য করেন। উপেন্দ্রনাথের কৃপায় শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া ইনি ভবিষ্যতে একজন গণ্যমান্য লোক হইয়াছিলেন। পরে তিনি রায় সাহেব উপাধি পাইয়াছিলেন।

The Musalman নামক বিখ্যাত সংবাদপত্রের স্বনামধন্য সম্পাদক মৌলবী মুজিবর রহমান সাহেব উপেন্দ্রনাথের আনুকুল্যে বাল্যকালে উচ্চশিক্ষা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ইংরেজী বিদ্যা-প্রচারে উপেন্দ্রনাথ উৎসাহী ছিলেন বলিয়া, আমাদের দেশীয় সনাতন বিদ্যার প্রতি তিনি আস্থা হারান নাই। তাঁহার গ্রামে একটি টোল প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তিনি সংস্কৃত শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা ১৩০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থী আহার ও আশ্রয় পাইয়া এই চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষালাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

কেবল বিদ্যালয়ই যে শিক্ষা-বিস্তারের সহায়ক, তাহা নহে। গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরী যে শিক্ষা-বিস্তারের এক অপূর্ব্ব উপায় তাহা আমরা জানি। উপেন্দ্রনাথ এই সত্য উপলব্ধি করিয়া গ্রামে একটি লাইব্রেরী গঠনে উদ্যোগী হন। তিনি ধীরে ধীরে লাইব্রেরীর জন্য পুস্তক কিনিতে আরম্ভ করেন। কেবল গল্প, উপন্যাস নহে, সারবান পুস্তকের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি এক-একটি পুস্তক ক্রয় করিয়া তাহা নিজে সযত্নে পাঠ করিতেন এবং তাহার পর পুস্তকটি

পাঠাগারে রক্ষা করিতেন। এইভাবে ধীরে ধীরে তাঁহার গ্রন্থাগার গড়িয়া উঠিল। পুস্তকগুলি যাহাতে গ্রামবাসীরা পড়িয়া উপকৃত হয় সে-বিষয়ে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল।

ধর্ম্মপ্রচারও যে শিক্ষার একটি অঙ্গ, তাহা উপেন্দ্রনাথ বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার পিতা পতিতচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত রাধাকান্ত জীউ মন্দিরে সে-বিষয়ে তিনি আয়োজন করিয়াছিলেন। মন্দিরের সংলগ্ন গৃহে যাহাতে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তনাদি হইতে পারে, সে সম্বন্ধে বন্দোবস্ত আছে। সেখানে সাধুদিগের বাসের ব্যবস্থাও আছে। এই কাজের জন্য তিনি দেবত্র সম্পত্তি করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার মন সঙ্কীর্ণতামুক্ত ছিল। তাহার প্রমাণ, তিনি বসিরহাটের নিকাশী পাড়ায় মসজিদ নির্ম্মাণের জন্য ভূমিখণ্ড প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

উপেন্দ্রনাথের এই সব কার্য্য যে, দেশের যথার্থ কল্যাণকর এবং ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আদর্শস্থল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের নূতন গৃহের উদ্বোধন-কালে প্রেসিডেন্সী বিভাগের তৎকালীন কমিশনার মিষ্টার কলিন্স বলিয়াছিলেন, "বর্ত্তমানে মফঃস্বলের জমিদার ও ধনীরা গ্রামত্যাগ করিয়া কলিকাতায় যাইয়া বিলাস-ব্যসনে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। ধান্যকুড়িয়ার জমিদারগণ এই নিয়মের ব্যতিক্রম। তাঁহারা প্রতিবেশীদিগকে আপনার মনে করিয়া তাহাদিগের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিয়া থাকেন।"

ইহার উপর আর মন্তব্য করিবার কিছু নাই।

গ্রামের সেবা—চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা

সে-সময়ে অধিকাংশ গ্রামেই সুচিকিৎসকের অভাব ছিল। ধান্যকুড়িয়াতেও সে অভাব ছিল। তা ছাড়া গ্রামবাসীগণ দরিদ্র থাকায়, প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত ব্যয়ে সুচিকিৎসক আনা তাহাদের সাধ্যের অতীত ছিল। গ্রামের হাতুড়ে চিকিৎসকগণই যথাসাধ্য চিকিৎসা বিধান করিত; কিন্তু সে চিকিৎসা স্থানে স্থানে মারাত্মক হইয়া উঠিত।

গ্রামে বাস করিতে করিতে ব্যাধিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের সুচিকিৎসার অভাব উপেন্দ্রনাথ প্রায়ই অনুভব করিতেন। আপনার জমিদারীর কাজ ও নানাবিধ কার্য্যের মধ্যে লিপ্ত থাকিলেও, তিনি অবকাশমত চিকিৎসা-শাস্ত্রাদি পাঠ করিতে থাকেন। হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী ও এলোপ্যাথি চিকিৎসার বহু গ্রন্থ তিনি পাঠ করেন এবং তাহারই ফলে গ্রামের রোগী-দিগকে নিজেই ঔষধ দিতেন।

একবার ধান্যাকুড়িয়া গ্রামে মহামারীরূপে কলেরার প্রকোপ ঘটে। একদিন অধিক রাত্রিতে এক ব্যক্তি উপেন্দ্র-নাথের নিকট আসিয়া ঔষধ চায়। উপেন্দ্রনাথ রোগীর অবস্থা শুনিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করেন, কিন্তু ঔষধ দিবার পর সে রাত্রিতে তাঁহার ঘুম হইল না। তিনি আত্মীয়দের বলিলেন—

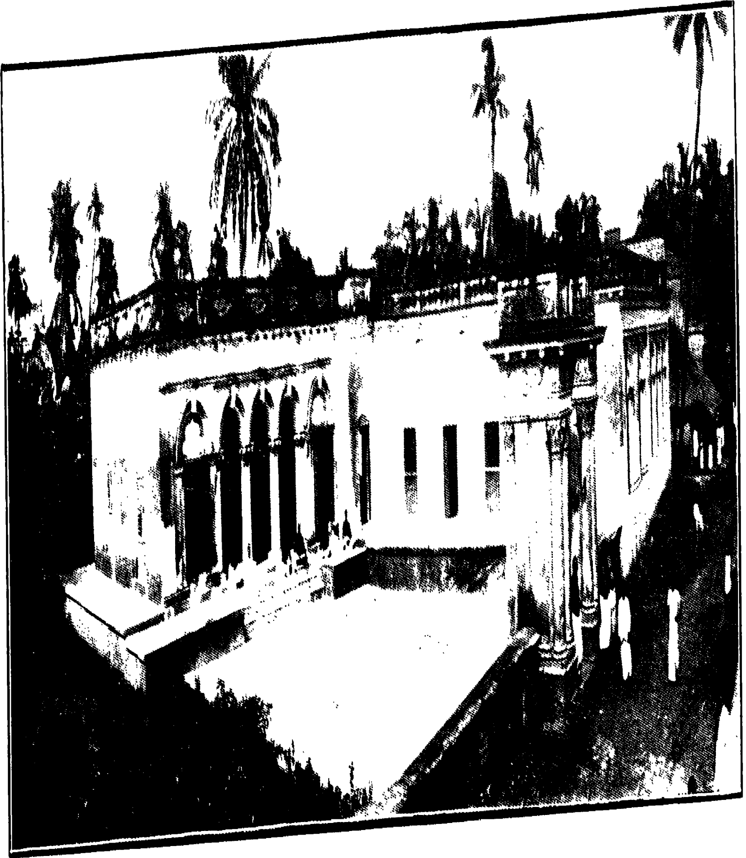
"দেখ, আমি ডাক্তারী ভাল জানি না, এরকম আন্দাজে ওষুধ দিয়ে কি ফল হ'বে বল্‌তে পারি না। রোগী যদি বাঁচে তবে বুঝ্‌ব ওষুধ ঠিক দেওয়া হ'য়েছে. আর যদি মরে তবে বুঝ্‌ব ভুল ওষুধ দিয়েছি। তখন দুঃখ রাখ্‌বার ঠাঁই থাক্‌বে না। এ ভাবে কতদিন চালাব ?"

ইহার কয়েক দিন পরেই তিনি একদিন কলিকাতায় গিয়া দুই তিন চাঙ্গারি এলোপ্যাথি ঔষধ কিনিয়া আনিলেন এবং আড়বেলিয়া গ্রামের ডাক্তার রাধারমণ বসু মহাশয়কে চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া, নিজের বাড়ীতে একটি ঘরে দাতব্য চিকিৎসালয়ের পত্তন করিলেন। প্রথমে, ডাক্তারবাবুর সহিত তিনি প্রতিদিন নিজ হাতে রোগীদের পরিচর্য্যা ও ঔষধ বিতরণ করিতেন। এইরূপ করিতে করিতে এই ক্ষুদ্র দাতব্য চিকিৎসালয়টি বৃহৎ আকারে পরিণত হয়। এই সময়ে তাঁহার জননী বাটীতে দুর্গোৎসব করিবার জন্য একদিন তাঁহার নিকট অভিলাষ প্রকাশ করেন। উপেন্দ্রনাথ মাতাকে বলিলেন—"মা, তোমার কথামত আমি দুর্গোৎসব কর্‌ব না বটে, কিন্তু এমন একটি কাজ কর্‌ব, যাতে বাড়ীতে রোজই দুর্গোৎসব ঘটে।"

এই কাজ হইতেছে, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মাতৃদেবীর নাম অনুসারে 'শ্যামাসুন্দরী দাতব্য চিকিৎসালয়' নাম দিয়া তিনি সেই ক্ষুদ্র চিকিৎসালয়টি বৃহৎ আকারে পরিণত করিলেন। তাঁহার মাতা পুত্রের

কার্য্যে এত দূর আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, নিজের সঞ্চিত ১২০০০ টাকা এই চিকিৎসালয়ে দান করিয়া যান। ইহা ছাড়া, চিকিৎসালয় যাহাতে সুভাবে চলিতে পারে, তাহার জন্য উপেন্দ্রনাথ বহু টাকার সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন।

যশ বা নামের লোভে তিনি এই চিকিৎসালয় স্থাপন করেন নাই। রোগজীর্ণ গ্রামবাসীর মঙ্গলের জন্য তথা জনসেবার আগ্রহেই তিনি এই কার্য্য করিয়াছিলেন। এমন কি তিনি যখন এই কার্য্যে অগ্রণী হন, তখন অনেকে ইহা বহু ব্যয়সাধ্য ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ বলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত ও নিরুৎসাহ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু উপেন্দ্রনাথ বিরুদ্ধ কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া, আপনার উৎসাহ-বশে এই সব প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার নির্ভীকতা ও অদম্য আত্মশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই 'শ্যামাসুন্দরী দাতব্য চিকিৎসালয়টি' সাধারণ দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে একটু পৃথক রকমের। এখানে গুরুতর রোগগ্রস্ত রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবান ঔষধ ব্যবহার করা হইয়া থাকে, রোগীকে নিজ ব্যয়ে তাহা কিনিয়া লইতে বলা হয় না।



শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত জীউর মন্দির

বিরাট দান

এই সময়কার একটি ঘটনা উপেন্দ্রনাথের জীবনের এক উজ্জ্বল অধ্যায় বলা যাইতে পারে এবং তাহা বঙ্গদেশের ইতিহাসেও এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। উপেন্দ্রনাথের উদার হৃদয়ে যে কত গভীর করুণা ছিল, তাহার পরিচয় এই ঘটনা হইতে পাওয়া যায়। ১৩০৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গদেশে ভীষণ অনাবৃষ্টি ঘটে, তাহাতে বঙ্গদেশের বহু স্থানে ভীষণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। চব্বিশ পরগণা জেলায়ও এই অন্নকষ্টের দারুণ চিত্র ফুটিয়া ওঠে। দেশের এই দুর্দ্দশার দিনে উপেন্দ্রনাথ বুভুক্ষু নরনারীকে অন্নদান করিয়া রক্ষা করিবার পুণ্যব্রত গ্রহণ করেন। সেই পুণ্যকাহিনীর বিবরণ আমরা ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ২১শে কার্ত্তিক তারিখের "সঞ্জীবনী" হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—

"অদ্য প্রায় এক বৎসর কাল অতীত হইতে লাগিল, জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ধান্যকুড়িয়া নামক গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ বল্লভ, শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ সাউ ও শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ গাইন্ মহোদয়গণ কর্ত্তৃক একটি অন্নছত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অন্নছত্র হইতে গত আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র মাস যাবৎ প্রায় তিন সহস্র লোক

প্রত্যহ রীতিমত অন্ন পাইয়াছিল। বর্ত্তমানে আউস ধান্য হওয়ায় লোকসংখ্যা অল্প হইয়াছে। এক্ষণে প্রত্যহ প্রায় এক হাজার আট শতেরও অধিক লোক অন্নগ্রহণ করিতেছে। আমরা জানি যে, যে সময় লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সে সময় প্রত্যহ ৩৫ মণেরও অধিক চাউল রন্ধন করিতে হইত ; এক্ষণে প্রত্যহ ২০ মণেরও অধিক চাউল রন্ধন করিতে হয়। প্রত্যহ যথাসম্ভব পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ডাল, একটা ব্যঞ্জন ও অম্ল ভোজ্যরূপে দেওয়া হয়। তদতিরিক্ত সপ্তাহে তিন দিন রোহিত মৎস্যের ঝোলও দিবার ব্যবস্থা আছে। অন্নছত্রের দুইটি বিভাগ—একটি হিন্দুদিগের নিমিত্ত, অপরটি মুসলমানদের নিমিত্ত। হিন্দু বিভাগে তিনজন পাচক ব্রাহ্মণ ও আটজন হিন্দু ভৃত্য এবং মুসলমান বিভাগে প্রায় বারো জন মুসলমান পাচক ও পাঁচজন মুসলমান ভৃত্য নিযুক্ত আছে। এখানে আহার করিয়া কাহাকেও স্থান পরিষ্কারাদি কার্য্য করিতে হয় না ; সে সমস্ত কার্য্য উহাদের পরিচর্য্যায় নিয়োজিত ভৃত্যবর্গ দ্বারা সম্পন্ন হয়। অতিথিশালার যাবতীয় কার্য্য নির্বাহের নিমিত্ত পৃথক অধ্যক্ষ ও সরকারাদি থাকিলেও, স্বয়ং উপেন্দ্রবাবু প্রত্যহ তাঁহার আবাস-বাটী হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরস্থ সেই অতিথিশালায় যাইয়া, নিজে প্রায় সমস্ত কার্য্য পরিদর্শন করিয়া থাকেন এবং যতক্ষণ না সমস্ত লোকের আহার সম্পন্ন হয়, ততক্ষণ গৃহে প্রত্যাগমন করেন না। এতদ্ভিন্ন নিকটবর্ত্তী গ্রাম-সমূহের ভদ্র ও উচ্চজাতীয় দরিদ্র

ব্যক্তিগণের নিমিত্ত, ইঁহারা চাল, ডাল ও আবশ্যকমত কিছু কিছু অর্থ সাহায্য দিবারও বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। কেহ আসিয়া তাঁহাদের নিকট স্বীয় পরিবারবর্গের দুরবস্থা জ্ঞাপন করিলে, তাঁহারা তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুযায়ী উল্লিখিত চাল ডাল বা অন্য প্রকার সাহায্য পাইয়া থাকেন। এই মহোদয়গণের সাহায্যে সুন্দরবনের নিকটবর্ত্তী প্রদেশবাসী দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিগণ এক প্রকার জীবিত আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগকে সাহায্য দানার্থ গভর্ণমেণ্ট কালীগঞ্জে যে দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার সংস্থাপিত করিয়াছেন, ঐ প্রদেশের অধিকাংশ লোক সেই স্থান অতিক্রম করিয়া ধান্যকুড়িয়ায় আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে দেখা যায়। এই সকল অনাহারক্লিষ্ট লোকের দৈহিক অবস্থা অতীব বিকৃত—মুখশ্রী বিবর্ণ, দেহ কঙ্কাল-বিশিষ্ট এবং প্রায় অধিকাংশের পরিধানে জীর্ণ শতগ্রন্থিযুক্তবাস ; ইহার উপরে আবার অনেকে দুর্ভিক্ষ সহচর নানাবিধ কঠিন পীড়াগ্রস্ত। দয়ালু উপেন্দ্রবাবু এই সকল বস্ত্রবিহীনদিগকে এক একখানি নূতন বস্ত্র দিয়াছেন এবং পীড়িতদিগের নিমিত্ত তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়ের (ইহা প্রায় দশ বৎসর যাবৎ স্থাপিত হওয়ায় এই দরিদ্র দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইয়াছে) চিকিৎসক ও কম্পাউণ্ডার দ্বারা চিকিৎসার ও ঔষধাদি প্রদানের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। এস্থানে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

সেটি এই, যে সকল আসন্নপ্রসবা স্ত্রীলোক এখানে আসিয়া আশ্রয় লওয়ার পর প্রসব হইতেছে এবং যাহারা সদ্যোজাত সন্তান বুকে লইয়া জঠর-জ্বালায় আবাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, মহাপ্রাণ উপেন্দ্রবাবু সেই সকল সদ্যপ্রসূতা মাতা ও সদ্যোজাত সন্তানের জন্য আবশ্যকানুসারে এক্ষেত্রে যেরূপ সম্ভব সেইরূপ পথ্য ও দুগ্ধাদির স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। যে সকল দুর্ভিক্ষকাতর লোকের প্রসঙ্গ করা হইল, ইহারা প্রথমে তাহাদের গৃহপালিত পশু, পরে অন্যান্য সাংসারিক দ্রব্য-সমুদয় অল্পমূল্যে বিক্রয় করিয়া তদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টা করিয়াছিল। পরে যখন দেখিল যে, ইহাতেও কুলাইল না, তখন তাহারা অনন্যোপায় হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্নের চেষ্টায় বহির্গত হইয়াছে। সহৃদয় ও সদ্বিবেচক উপেন্দ্রবাবু তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যাহাতে তাহাদের স্বদেশ-প্রতিগমন পাথেয়াদি সঞ্চিত হয় এবং দেশে গিয়া অর্থাদি অভাবে হঠাৎ বিপন্ন হইতে না হয়, এ নিমিত্ত যাহারা স্বীকৃত হইতেছে তাহাদিগের দ্বারা অতি সামান্য কার্য্য তাহাদের ইচ্ছানুরূপ সময় পর্য্যন্ত করাইয়া লইয়া প্রত্যহ প্রত্যেককে উচিৎ প্রাপ্যের অতিরিক্ত কিছু কিছু অর্থ দিতেছেন।”

এই অন্নদান ব্যাপারে উপেন্দ্রনাথের বিপুল মহত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। সে মহত্ত্ব অপূর্ব্ব ও অনন্যসাধারণ।

এই সঙ্গে তাঁহার ঔদার্য্যের আর একটি পরিচয় পাওয়া যায়। সেটি এই যে, তাঁহার অন্নছত্রের দুইটি বিভাগ ছিল—একটি হিন্দুদিগের জন্য এবং অপরটি মুসলমানদিগের জন্য। মুসলমান বিভাগটি, হিন্দু বিভাগ অপেক্ষাও বৃহৎ ছিল। কারণ, আর্ত্ত মুসলমান প্রজাই অধিক অন্নের জন্য আসিত। আমাদের এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের দিনে উপেন্দ্রনাথের মহত্ত্ব স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

এই সৎকর্ম্মে উপেন্দ্রনাথের চরিত্রের কয়েকটি বিশেষ গুণ আমাদের বিশেষভাবে উপলব্ধি করা উচিত। প্রথমতঃ তাঁহার হৃদয়ে দরিদ্র ও আর্ত্তজনের জন্য অশেষ করুণা ছিল। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ বোধের যে সঙ্কীর্ণতা, তাহা তাঁহার ছিল না। তৃতীয়তঃ, সকল কর্ম্ম সমাপ্তি পর্য্যন্ত পরিদর্শন করার ইচ্ছায় তাঁহার স্বাবলম্বন-শক্তি প্রকাশ পাইতেছে। চতুর্থতঃ, বৃহৎ কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও নারী ও শিশুগণের অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করার শক্তি তাঁহার ছিল। পঞ্চমতঃ, সামান্য কর্ম্ম করাইয়া তিনি দরিদ্র ব্যক্তিগণকে যে পারিশ্রমিক স্বরূপ পাথেয় দান করিতেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, তিনি মানুষের আত্মশক্তির প্রতি সম্মান পোষণ করিতেন।

এই বিরাট অন্নদান ব্যাপারে, উপেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহকর্ম্মী বল্লভ ও গাইন্ মহাশয়গণ যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আজ অবধি বহু দেশবাসীর মনে জাগ্রত আছে। এই

কার্য্যের জন্য খুলনা, নদীয়া, যশোহর ও চব্বিশ পরগণা জেলা চতুষ্টয়ের বহু পরিবারে এখনও তাঁহাদিগের নাম পরিচিত এবং লোকে তাঁহাদিগের কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগের বংশধরদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি দানের কথাও উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উপেন্দ্রনাথ তাঁহার মাতা শ্যামা-সুন্দরীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রনারায়ণদিগের জন্য প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ টাকার উপর দান করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় ব্যবসাকার্য্যে

আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের নিকট উপেন্দ্রনাথ প্রায়ই বলিতেন,—"অর্থ থাক্‌লে অর্থের সদ্ব্যবহার করা উচিত। তা না কর্‌লে অর্থ থাকার প্রয়োজন কি?"

এই মনোভাবের বশেই তিনি নিজ গ্রামে আপনাদের অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া গ্রামের বহুবিধ চিরন্তন মঙ্গল সাধন করেন। নাম বা যশের জন্য তিনি লোলুপ ছিলেন না। তাহা যদি থাকিতেন তবে মোটা মোটা অর্থদান করিয়া সংবাদপত্রে তাহা প্রচারিত করাইয়াই ক্ষান্ত হইতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তাহার পরিবর্ত্তে তিনি এক একটি কাজ প্রয়োজন অনুসারে অত্যন্ত ক্ষুদ্রভাবে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে বৃহৎ আকারে উন্নীত করিয়াছেন।

যেমন বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষায় নিবিষ্ট থাকার সময় পিতার মৃত্যুতে তাঁহাকে গ্রামে চলিয়া আসিতে হয়, তেমনই তিনি যখন গ্রামে জনহিতসাধনকর্ম্মে প্রগাঢ়ভাবে নিযুক্ত, তখন তাঁহার পরম হিতৈষী, যৌথ ব্যবসায়ের অন্যতম পরিচালক, ভগিনীপতি শ্যামাচরণ বল্লভ মহাশয়ের মৃত্যু ঘটিল। গ্রাম-সেবক উপেন্দ্রনাথের কানে সহরের ডাক আসিয়া পৌঁছিল। সে আহ্বানে তাঁহাকে সাড়া দিতেই

হইল, কারণ, বল্লভ মহাশয়ের প্রয়োজনীয় স্থান দখল না করিলে ব্যবসায়ে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ছিল। গ্রামের কর্ম্মবীর শহরের কর্ম্মে যোগ দিলেন। যে নিরলস যত্ন, প্রচেষ্টা ও অদম্য শক্তিতে তিনি গ্রামকে সমুন্নত করিতেছিলেন, তাহা এইবার তাঁহাকে ব্যবসায়কার্য্যে প্রয়োগ করিতে হইল। উপেন্দ্রনাথের উদ্যম ও উৎসাহের যে অভাব ছিল না এবং তিনি যে অসাধারণ কর্ম্মী পুরুষ ছিলেন, তাহার পরিচয় তাঁহার এই দ্বিবিধ কর্ম্মের মধ্যেই রহিয়াছে। এক কর্ম্ম গ্রাম-সেবা, দ্বিতীয় কর্ম্ম ব্যবসায় পরিচালন। ধনীর সন্তান হইয়াও আরামে-বিলাসে নিজেকে ডুবাইয়া দেন নাই, পরন্তু শ্রান্তি-ক্লান্তিহীন কঠোর কর্ম্মে সারাজীবন ব্যাপৃত ছিলেন, ইহাই উপেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। নিজের অর্থ অশেষভাবে পরের মঙ্গলে নিয়োগ করা এবং নিজেকে সর্ব্বদা কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ রাখা, ইহা আধুনিক যুগে এক বিস্ময়ের ব্যাপার। তাঁহার এই দ্বিবিধ কর্ম্মই আধুনিক কালে বাঙ্গালীর জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ। এখন শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে একদল বিবিধ ব্যবসার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন এবং আর একদল গ্রামের উন্নতিসাধন করিবেন, ইহাই আমাদের কামনার ও লক্ষ্যের বিষয় হওয়া উচিত।

উপেন্দ্রনাথ যখন গ্রামের কাজে নিমগ্ন, কলিকাতায় তখন শ্যামাচরণ বল্লভ মহাশয় ও গাইন মহাশয়গণ তাঁহাদের

প্রতিষ্ঠিত পি, জি, এণ্ড ডাবলু সাউ নামক কারবার যথাশক্তি পরিচালন করিয়া পাটের ব্যবসায়ে তাঁহাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছিলেন। এই ব্যবসায়ে তাঁহারা অশেষ সম্পৎশালী হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের এই পাটের ব্যবসা এমনই উন্নত হইয়া উঠে যে, ইহা আর সকল ভারতীয় পাটের ব্যবসাকে পরাভূত করিয়া দেয়। ইহারা বহু স্থানে পাটের মোকাম করিয়া পাট-গাঁইট-বাঁধা কল স্থাপন করিলেন। কলিকাতায় চিৎপুরে ও কাশীপুরে তাঁহাদের স্থাপিত পাট-গাঁইট-বাঁধা কল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দিনের পর দিন এই কোম্পানীর মাল ইউরোপে ও আমেরিকায় বিশেষ সমাদর লাভ করিতে লাগিল। ভারতীয় পাট ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে ইঁহারা শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন। ইহা বাঙ্গালী জাতির গৌরবের কথা। এই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা নূতন নূতন জমিদারী ক্রয় করিতে লাগিলেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে (১৩০৫ সালে) শ্যামাচরণের মৃত্যুতে উপেন্দ্রনাথকে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাদের এই প্রতিপত্তিশালী ব্যবসার পরিচালন-কার্য্য গ্রহণ করিতে হইল। উপেন্দ্রনাথ তখন একক। জমিদারী পরিচালনের ভার তখন তাঁহার স্কন্ধে। ইহার উপর ব্যবসা চালানোর ভার তাঁহার উপর পড়িল। এই দুইটি কার্য্যের যে-কোনটি একজন লোকের উপর পড়িলে গুরুভার হইত; কিন্তু শক্তিশালী কর্ম্মী উপেন্দ্রনাথ দুইটি গুরুতর কার্য্যই সমান

আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ-গুণে ব্যবসার কার্য্য পূর্বের মত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এই গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হইলেও উপেন্দ্রনাথ আপনার গ্রামের কথা এবং বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি যে-সকল প্রতিষ্ঠান সেখানে তাঁহার যত্নে সৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়াছিল, সেগুলির কথা বিস্মৃত হ'ন নাই। মাঝে মাঝে ব্যবসা-কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি গ্রামে যাইতেন এবং সেই সব প্রতিষ্ঠান সুপরিচালনের ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার পিতার যত্নে তাঁহাদের গ্রামে গুড় ও দেশী চিনির ব্যবসা চলিতেছিল; সেগুলির প্রতিও তাঁহার মনোযোগ ছিল। তিনি ছাত্রদিগকে এই ব্যবসা গ্রহণ করিতে প্রায়ই উৎসাহ দিতেন; সাধারণতঃ ব্যবসায়-কার্য্যে অবহেলার জন্য বাঙ্গালী যে অধঃপতনের পথে নামিয়া চলিয়াছে, এই কথা ছাত্রদিগকে বারংবার বলিতেন।

কলিকাতার কর্ম্মক্ষেত্রে

যৌবনের প্রারম্ভে পিতার মৃত্যুর পরে উপেন্দ্রনাথ যখন জমিদারীর ভার লইয়া গ্রামে আসিলেন, তখন যেমন জমিদারী পরিচালনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে গ্রাম্য হিতসাধন করিতে হয়, তেমনি কলিকাতায় আপনাদের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিতে আসিয়া তাঁহাকে কলিকাতার কয়েকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে হয়। কর্ম কর্মীর জন্যই অপেক্ষা করে। জন-সেবক উপেন্দ্রনাথ কলিকাতাতেও জনসেবার পথ খুঁজিয়া লইলেন।

তিনি কলিকাতার ধূম-উৎপাত-সমিতির সদস্য ও বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স নামক বণিক সমিতির সভ্য হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। উপেন্দ্রনাথ তাহাতে বহু টাকা মূলধন দিয়া তাহার উন্নতির সহায়ক হইলেন; আবার এই ব্যাঙ্কের অন্যতম পরিচালক হইয়া ইহার কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

আমাদের দেশ সাধারণতঃ দরিদ্র। এখানকার ব্যবসায়ীরা মূলধনের অভাবে যে কিরূপ বিব্রত হইয়া পড়ে, এবং মোটেই উন্নতিলাভ করিতে পারে না, তাহা উপেন্দ্রনাথ

জানিতেন তিনি ইহার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি নিজে বহু ব্যবসায়ীকে অতি অল্প সুদে ও পরিশোধের পথ সুগম করিয়া অর্থ দিতেন। তাহাতে বহু টাকা নষ্ট হইলেও তিনি সে কার্য্য ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু একজনের ব্যক্তিগত চেষ্টা যে এই ব্যাপারে সমুদ্রে বিন্দুবর্ষণের মত, তাহা তিনি জানিতেন। সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা ব্যতীত এই অভাব দূর করা সম্ভব হইতে পারে না। সেই-জন্যই প্রতীচীতে যৌথ কারবারের সৃষ্টি হইয়াছে। সেরূপ কারবারে বহুলোকের অর্থ অল্পসংখ্যক লোকের পরিচালনায় ব্যবহৃত হয়। এ দেশে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বহুকাল পূর্বে হইয়াছিল এবং তাহা সফল হয় নাই। যখন বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইল, তখন উপেন্দ্রনাথ সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। ব্যাঙ্কের পরিচালন-কার্য্য যখন অনাচার-কলুষিত হইল, তখন তিনিই প্রথম সে-বিষয়ে পরিচালক সমিতির মনোযোগ আকৃষ্ট করিলেন; কিন্তু প্রতিকারের প্রকৃত পথ অবলম্বিত না হওয়ায় তিনি প্রতিবাদ-কল্পে ডিরেক্টরের পদ ত্যাগ করিলেন। বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সর্বনাশের ইতিহাস বাঙ্গালীর কলঙ্ক-জনক। কেন-না, সে ব্যাঙ্ক কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায়, লোকের অকারণ শঙ্কায় বা পরিচালকদের বিবেচনার দোষে নষ্ট হয় নাই; তাহা নষ্ট হইয়াছিল—অসাধুতায়। উপেন্দ্রনাথ যখন ইহার ত্রুটি দেখাইয়াছিলেন, তখন পরিচালকগণ যদি

সর্ব্বতোভাবে আপনাদের কর্ত্তব্যে অবহিত হইতেন, তবে এই ব্যাঙ্ক সাফল্যের গৌরবে উজ্জ্বল হইয়া বাঙ্গালীর অশেষ উপকার করিতে পারিত—বাঙ্গলার ব্যবসাক্ষেত্রে নবযুগ প্রবর্ত্তনে অগ্রণী হইত। কিন্তু বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যে তাহা হয় নাই।

বিবিধ দান

জনহিতকর কার্য্যে যাঁহারাই লিপ্ত থাকেন, তাঁহাদিগকে জনগণের বহুবিষয়ক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। সাধারণের শিক্ষা, ব্যবসায় কার্য্যে মনোযোগ, ধর্মভাবের উন্নতি, স্বাস্থ্যোন্নতি, বিপদ হইতে মুক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজনের দিকেই দেশসেবকের দৃষ্টি থাকে। এই সমস্ত বিষয়েই উপেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা সমভাবে বর্ত্তমান ছিল। তাহার পরিচয় আমরা দিয়াছি। এই অধ্যায়ে আমরা তাঁহার বহুমুখী সেবার পোষক বিবিধ দানের কথা উল্লেখ করিব। এইখানে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, এই সব কার্য্যে সাধারণতঃ দুই রকমের কর্মী দেখিতে পাওয়া যায়—এক, যাঁহারা অর্থহীন অবস্থায় কেবলমাত্র আত্মশক্তি অবলম্বন করিয়া ও অপরের অর্থ-সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া কাজ করেন; দুই, যাঁহারা কেবল অর্থদান করেন অথচ কোনরূপ কর্মে লিপ্ত হন না। কিন্তু উপেন্দ্রনাথের চরিত্রে এই সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তিনি নিজেই কর্মী ও দাতা দুইই ছিলেন। তাঁহার এই স্বভাব গ্রামসেবার প্রত্যেক কর্মে সুপরিস্ফুট। তাঁহার সকল প্রচেষ্টাকেই দানময় কর্ম বা কর্মময় দান বলা যাইতে পারে।

যাহা হউক, এখানে আমরা তাঁহার পূর্বে উল্লিখিত দানময় কর্ম ছাড়া আরও অনেকগুলি দানের বিষয় উল্লেখ করিব।

শিক্ষায় দান—উপেন্দ্রনাথ তাঁহার স্বগ্রামে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাঁহার দেশের উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের পথ সুগম করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন না। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য, যে কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট সাহায্য-প্রার্থী হইলে তিনি মুক্ত হস্তে তাহাকে অর্থ সাহায্য করিতেন। উপেন্দ্রবাবুর চতুর্দ্দশ স্মৃতি-বার্ষিকী সভায় নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু পৌরোহিত্য করেন। তাঁহার অভিভাষণে তিনি উপেন্দ্রনাথের গুণাবলী কীর্ত্তনের সময় বলেন, "কলিকাতায় শ্যামবাজার এ, ভি স্কুলের সুবৃহৎ গৃহের ভিত্তিস্থাপন তিন জন মহাপ্রাণ ব্যক্তির উৎসাহ ও অর্থ-সাহায্যে সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহারা হইতেছেন, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, অনারেব্‌ল্‌ ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও রায় বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ সাউ। ইঁহাদের প্রাথমিক উৎসাহ ও সাহায্য না পাইলে বিদ্যালয়ের ঐরূপ সুবৃহৎ গৃহ প্রস্তুত করা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ।"

নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে বা শিক্ষাসংক্রান্ত কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে উপেন্দ্রনাথ সেখানে গিয়া আনন্দের সহিত যথোচিত অর্থ সাহায্য বা পরামর্শ দান করিতেন। কলিকাতার বালিকাদিগের শিক্ষালয়, 'মহাকালী পাঠশালায়' তিনি একবার বিশেষ অর্থ সাহায্য করেন।

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর ১৯০২ সালের বাৎসরিক বিবরণীতে সেই লাইব্রেরীর উন্নতির জন্য উপেন্দ্রনাথের মুক্তহস্ত দানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

তাঁহার নিজ বিদ্যালয় হইতে যে-সব ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত, তিনি তাহাদিগকে সে বিষয়ে অর্থ সাহায্য করিতেন।

আবার যদি কোন ছাত্র ইউরোপে গিয়া উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ব্যাকুল হইত, তাহা হইলে তাহাদিগকে উপেন্দ্রনাথ আর্থিক সহায়তা করিতেন। একবার, এক ছাত্র জাপানে গিয়া শিক্ষালাভ করিতে আগ্রহী হন। তাঁহার নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়া তিনি উপেন্দ্রনাথের নিকট আবেদন করেন। উপেন্দ্রনাথ তাঁহাকে এই শিক্ষালাভে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। মিঃ জে ব্যানার্জি নামে একজন ছাত্র লণ্ডনে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য গিয়া উপেন্দ্রনাথের আর্থিক আনুকূল্যে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। তিনি বিলাত হইতে পত্র দ্বারা উপেন্দ্রনাথের কাছে ১৮৯৭ সালের ১৬ই জুলাই তারিখে এক ইংরেজী পত্রে যাহা লেখেন তাহাতে বুঝা যায় যে, তিনি বিলাত যাইবার সময় উপেন্দ্রনাথের দানের উপর একান্ত নির্ভর করিয়াছিলেন। উপেন্দ্রনাথ শিক্ষার জন্য যে মুক্তহস্তে দান করিতেন, তাহার উল্লেখ এই পত্রে আছে।





শ্যামাসুন্দরী দাতব্য চিকিৎসালয়

উক্ত ভদ্রলোক অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়া উপেন্দ্রনাথকে যে-সব পত্র লেখেন, তাহার মধ্যে আমাদের হস্তগত তিনখানি পত্র হইতে আমরা কিছু কিছু অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি :—

"…I was informed from a reliable source that you did not like to give publicity to your charities……. I know you are the last man to refuse a helping hand in the cause of education…"

—London, 16th July, 1897.

"You are my greatest benefactor and friend……. After my admission and before my call to the Bar, I must pay besides £90, paid on admission, another sum of £49…if you do not give me Rs. 500/-in October I shall not be able to join the Inn at all……"

—London, 3rd September, 1897.

"You spend bigger sums for the welfare of your countrymen, and for the education of my compatriots. When you have decided to award me a favour, please send it in time……"

—London, 24th September, 1897.

উপেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার ইচ্ছানুসারে বসিরহাটবাসীর এক উপকার সাধিত হইয়াছে। বসিরহাটে সাধারণের সভাসমিতির জন্য কোন ভবন ছিল না; সেই জন্য তিনি তথায় একটি টাউন হল প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনকালে তাহা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার পর তাঁহার বংশধরগণ ও তাঁহার সুযোগ্য ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত রায় দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ বাহাদুর বহু অর্থব্যয়ে বসিরহাটে একটি সুবৃহৎ টাউন হল প্রতিষ্ঠা করেন এবং উহা উপেন্দ্রনাথের পুণ্য নামে উৎসর্গ করিয়া সেখানকার মিউনিসিপ্যালিটিকে দান করিয়াছেন।

চিকিৎসা-কার্য্যে দান—আপনার হাঁসপাতালে প্রভূত সহায়তা ছাড়া চিকিৎসা-কার্য্যে তাঁহার আরও দানের কথা জানিতে পারা যায়। বসিরহাটে প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারখানায় যাহাতে স্ত্রীলোকগণের জটিল রোগের চিকিৎসা সাধিত হইতে পারে, সেইজন্য একজন স্ত্রী চিকিৎসক রাখিবার জন্য তিনি কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া তথায় দান করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

ধর্মকার্য্যে দান—সুবিখ্যাত পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ প্রণীত বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কীয় গ্রন্থ "শ্রী রায় রামানন্দের জীবনী ও উপদেশ" নামক গ্রন্থ মুদ্রণের সমস্ত ব্যয়-ভার উপেন্দ্রনাথ বহন করিয়াছিলেন। তিনি বৃন্দাবন-ধামে ৺মদনমোহন ও গোপীনাথ জীউর মন্দিরের দরজা

রূপা দ্বারা তৈরী করিবার জন্য ও বৃন্দাদেবীর মন্দির নির্ম্মাণের জন্য বহু অর্থ দান করিয়াছেন।

তাঁহার পিতৃদেব-প্রতিষ্ঠিত রাধাকান্ত জীউ ঠাকুরের জন্য সুদৃশ্য মন্দির এবং সাধু ও বৈষ্ণবদিগের থাকিবার জন্য গৃহ তিনি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

ঠাকুর-সেবা ও অভ্যাগত সাধু ও বৈষ্ণবদিগের সেবা প্রভৃতি খরচের জন্য তিনি বহু সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন।

পিঁজরাপোলে গো-সেবার জন্য তিনি বহু অর্থদান করেন।

বিপদে সহায়তা— বসিরহাট নিকারীপাড়ায় এবং গোবরা নামক স্থানে অগ্নিদাহে বহু মুসলমান গৃহস্থের সর্ব্বনাশ হইলে, উপেন্দ্রনাথ বিশেষ আর্থিক সহায়তা করিয়া বিপন্ন ব্যক্তিদিগকে উদ্ধার করেন।

ইহা ছাড়া কন্যাদায় ও দেনার দায়ে বিপন্ন বহু গৃহস্থকে তিনি অর্থ সাহায্যে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পণ্ডিত শিবনাথ সার্ব্বভৌম মহাশয় কর্তৃক আনীত ভাটপাড়া-নিবাসী এক বিপন্ন ব্রাহ্মণের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সার্ব্বভৌম মহাশয় কলিকাতায় বহু ধনীর নিকট অর্থ সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইয়া নিরাশ হন। অবশেষে উপেন্দ্রনাথের নিকট গিয়া তিনি জানান যে, ঋণের দায়ে ব্রাহ্মণের সর্বস্ব, এমন কি

ভিটাবাড়ী পর্য্যন্ত ক্রোক হইয়াছে। পরদুঃখকাতর উপেন্দ্রনাথ, তাঁহাদিগকে এক নির্জন কক্ষে লইয়া গিয়া তাঁহাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত টাকা দান করেন।

এইরূপ গোপন দান তাঁহার যথেষ্ট ছিল। তাঁহার এই সব দানে পক্ষপাতিত্ব মোটেই ছিল না। তাঁহার দানকার্য্যে হিন্দু ও মুসলমান কিম্বা উচ্চ নীচ ভেদাভেদ ছিল না।

জলকষ্ট নিবারণেও তাঁহার আর্থিক সাহায্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি আপন জমিদারীর মধ্যে অনেক স্থানে সুপেয় জলের জন্য পুষ্করিণী খনন ও সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন।

প্রজা-হিতৈষী জমিদার বলিতে যাহা বুঝায় তিনি সর্ব-প্রকারে তাহাই ছিলেন। তিনি প্রজাগণকে শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে ও সচ্ছলতায় উন্নীত করিতে সর্বদাই চেষ্টা করিতেন।

ধান্যকুড়িয়ার সাউ পরিবার, গাইন পরিবার ও বল্লভ পরিবার সে অঞ্চলে সকল সৎকর্মে যে কিরূপ পরস্পরের সহায়ক ও সহকর্মী তাহার নিদর্শন পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। তথাপি বলিতেছি যে, ধান্যকুড়িয়া গ্রামটিকে আদর্শ গ্রামে পরিণত করার উদ্দেশ্যে উপেন্দ্রনাথের সহিত সহযোগিতা ছাড়াও স্বতন্ত্রভাবে সেখানকার অন্যতম জমীদার স্বর্গীয় নফরচন্দ্র গাইন্ মহাশয়ের পুত্রগণ সেখানে একটি প্রসূতি হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঐ অঞ্চলের একটি বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছেন; এবং রায় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ

বল্লভ বাহাদুর ও তাঁহার ভ্রাতাগণ "দাক্ষায়ণী বালিকা বিদ্যালয়" স্থাপন করিয়া বালিকাদের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। গত ১৩১৯ সালের ১৮ই মাঘ তারিখের হিতবাদীতে এই তিন পরিবারের একটি সৎকীর্তির বিবরণ প্রকাশিত হয়। তাহা এই :—

"গত ২৫শে পৌষ তারিখে ২৪ পরগণার অন্তর্গত ধান্যকুড়িয়া গ্রামে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৩০টি পরিবার নিরাশ্রয় হইয়াছে। তাঁহাদিগের পরিধানে যে-বস্ত্র ছিল তাহা ছাড়া তাঁহাদের কিছুই নাই। এই দুর্ঘটনা উপলক্ষে স্থানীয় জমিদার মহাশয়েরা যে সদাশয়তার পরিচয় দিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কয়েকখানি পত্র পাইয়াছি। একজন পত্র-লেখক লিখিয়াছেন—"জমিদার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সাউ মহোদয় ও জমিদার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ মহোদয়ের পুণ্যবতী মাতাঠাকুরাণী প্রত্যেক পরিবারের বাসোপযোগী একখানি শয়নগৃহ ও একখানি রন্ধনশালা নির্মাণ করাইয়া দিতেছেন এবং একখানি করিয়া কম্বল প্রত্যেককে দান করিয়াছেন। পরদুঃখকাতর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গাইন মহোদয়ও নিরাশ্রয় জনগণের জন্য পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন এবং গৃহ নির্ম্মিত না হওয়া পর্য্যন্ত নিজের অট্টালিকার কয়েকখানি গৃহ ও বাগানবাড়ীখানি তাঁহাদিগকে ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই সকল দানশীল স্বধর্মনিষ্ঠ মহাত্মা স্বেচ্ছা-

প্রণোদিত হইয়া যে সদনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা যে ধনীমাত্রেরই অনুসরণীয় ইহা বলাই বাহুল্য। বাঙ্গলাদেশের এমন দুর্ভাগ্য যে, কাম্স্কাটকা বা পেরু প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হইলে, ভূমিকম্পে তত্রত্য অধিবাসীরা নিরাশ্রয় হইলে আমরা চাঁদার খাতায় স্বাক্ষর করিয়া রাশি রাশি অর্থ ঢালিয়া দিতে পারি, কিন্তু আপনার প্রতিবেশীরা বিপন্ন হইলে তাঁহাদিগের সাহায্যের জন্য এক কপর্দকও দান করি না।"

সেই সময়কার হিতবাদী, সঞ্জীবনী, নায়ক, বেঙ্গলী, অমৃতবাজার পত্রিকা, বসুমতী, ইণ্ডিয়ান্ ডেলী নিউজ্, প্রভৃতি সংবাদপত্রে উপেন্দ্রনাথের বিবিধ দানের কথা প্রচারিত হইয়াছিল।

চরিত্র-প্রসঙ্গ

আমরা মানুষটির জীবনের ক্রমবিকাশ পর পর লক্ষ্য করিলাম। আমরা দেখিলাম, সমৃদ্ধির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও উপেন্দ্রনাথ আরামপ্রিয় হন নাই, জ্ঞানস্পৃহা তাঁহার প্রবল ছিল—আত্মশিক্ষা ও দেশবাসীর শিক্ষায় তিনি অবহিত ছিলেন ; দেশের সেবা, বিশেষ করিয়া পল্লীর সেবা তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ম ছিল। দরিদ্র ও বিপন্ন জনগণের উন্নতির জন্য তিনি অবিরাম মুক্তহস্তে অর্থদান করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন ; এবং আধুনিক বাঙ্গালীর মুখ্য অবলম্বনীয় বস্তু যে ব্যবসায়কার্য্য তাহাতেও তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

এমন মানুষের যে অন্যান্য বহুবিধ সৎগুণ থাকে, তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। আমরা এইবার সেই সৎগুণাবলীর উল্লেখ করিয়া এই পুণ্য জীবন-কথা সমাপ্ত করিব।

স্বাভাবিক জ্ঞানানুরাগ বশে আত্মশিক্ষার প্রতি উপেন্দ্রনাথের প্রখর দৃষ্টি ছিল। যৌবনের প্রারম্ভে তাঁহাকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হইলেও এবং সারাজীবন বিবিধ কর্মে লিপ্ত থাকিলেও, তিনি অবকাশমত নিয়মিতভাবে

জ্ঞানচর্চা করিতেন। যৌবনকালে উপেন্দ্রনাথ হরিণাভি-নিবাসী স্কুল-ইনস্পেক্টর ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং অন্য ব্রাহ্ম ধর্মপ্রচারকদিগের সংস্পর্শে আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হন এবং ব্রাহ্ম উপাসনা অনুসরণ করিতে থাকেন। পরে পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ, মহেশচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার ও মহেশচন্দ্র তর্করত্ন প্রভৃতির সহিত বেদান্ত আলোচনা করেন। কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে তিনি অতিশয় ভক্তি করিতেন এবং বহুদিন তাঁহার নিকট বেদান্তপাঠ ও আলোচনা করেন। কিছুদিন পরে সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য রসিকমোহন বিদ্যাভূষণের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। উপেন্দ্রনাথের পিতৃ-পিতামহ বংশানুক্রমে বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া বৈষ্ণব ভাব তাঁহার মধ্যে নিহিত ছিল। এই সময় হইতে তিনি বৈষ্ণব ধর্মের সবিশেষ আলোচনা করিতে থাকেন। ফলে উক্ত ধর্মের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। উপেন্দ্রনাথ অনুরাগী বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের গ্রামের ধর্মসভার বিশিষ্ট সভ্যরূপে উপেন্দ্রনাথ প্রগাঢ় ভক্তির সহিত সেখানে ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা করিতেন। প্রতিদিন প্রায় দুই ঘণ্টাকাল দেবপূজায় নিরত থাকিতেন। ধর্মগ্রন্থ প্রকাশের জন্য তিনি পণ্ডিতদিগকে বহু অর্থ দান করিয়াছেন।

সংস্কৃত শাস্ত্রে উপেন্দ্রনাথ বিশেষ অনুরাগ ও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে ও ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রে

অনুশীলন দ্বারা তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। ফলে তিনি মাঝে মাঝে গ্রহগণের উদয়-অস্ত দর্শন করিয়া উক্ত শাস্ত্রের সহিত মিলাইতেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, পণ্ডিতগণের সহযোগিতায় প্রচলিত পঞ্জিকার সংস্কার করেন। কিন্তু তাঁহার অসুস্থতা ও অকালমৃত্যুতে এই কার্য্য সমাধা হয় নাই।

এলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, কবিরাজী প্রভৃতি চিকিৎসা গ্রন্থ মনোযোগ দিয়া পাঠ করিয়া তিনি ঐ সব বিষয়ে কতকটা জ্ঞান অর্জন করেন।

তিনি বিশেষ অতিথি-সেবা-পরায়ণ ছিলেন। অতিথিগণের বাসের জন্য তিনি একটি অতিথিশালা নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সত্যবাদিতা—গুরুজন-ভক্তি, আহারে, পোষাকে ও আচরণে সম্পূর্ণ আড়ম্বরহীনতা, কথা দিয়া কথা রক্ষা, পরের মনে কষ্ট না দেওয়া প্রভৃতি বহু সৎগুণের পরিচয় তাঁহার জীবনে পাওয়া যায়। উপেন্দ্রনাথ কখনও মিথ্যা কথা বলিতেন না ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেন না। একবার ২৪ পরগণার জনৈক বিশিষ্ট জমিদারের একটি জমিদারী নিলামে (Revenue Sale) উপেন্দ্রনাথ খরিদ করেন। পরে, ঐ জমিদার মহাশয় উপেন্দ্রবাবুর নিকট আসিয়া ঐ সম্পত্তি তাঁহাকে ফেরত দিবার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করেন। উপেন্দ্রনাথ তাঁহার জমিদারী তাঁহাকে ফেরত

দিতে সম্মত হন। ইহার অল্প কয়েক দিন পরে অপর এক ব্যক্তি উপেন্দ্রনাথের নিকট হইতে উক্ত জমীদারী খরিদ করিবার ইচ্ছা করেন এবং উপেন্দ্রনাথ উহা যে মূল্যে খরিদ করিয়াছেন তাহার উপর তিন সহস্র টাকা বেশী দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। উপেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলেন,—"যাঁর জমিদারী আমি খরিদ করেছি, তাঁকেই আমি যে মূল্যে কিনেছি ঐ মূল্যেই ফেরৎ দেবো ব'লে কথা দিয়েছি। সেজন্য সেটা আমি আপনাকে বিক্রয় কর্‌তে পার্‌ব না।"

নিজের সুখ-সুবিধার জন্য তিনি দরিদ্র প্রজাগণকে কখনও পীড়ন করিতেন না। তাহাদের মঙ্গলের জন্য নিজে কিছু অসুবিধা বা ক্ষতিভোগ করিতে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। দরিদ্র প্রজাদিগকে অভয় দান করা এবং বিপদে-আপদে আর্থিক সহায়তা করা, উপেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক কার্য্য ছিল।

শেষ জীবন ও সম্মান লাভ

উপেন্দ্রনাথ গ্রামের কাজ একাকী বহুদিন পরিচালনা করিয়াছিলেন। তারপর নিজেদের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নামিয়া সেই কার্য্যে এবং সাধারণের হিতকর কতকগুলি কার্য্যে তাঁহাকে অবিরাম ব্যাপৃত থাকিতে হয়। এই পরবর্ত্তী কর্ম্মগুলির মধ্যে নামিয়াও তিনি তাঁহার গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবহেলা করেন নাই। তিনি প্রায়ই গ্রামে যাইতেন এবং সেইসব প্রতিষ্ঠানের রীতিমত তত্ত্বাবধান করিতেন। এই গুরুতর পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। তিনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইলেন। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের জন্য বারংবার উপদেশ দেন; কিন্তু কর্ম্মেই যাঁহার আনন্দ, কর্ম্ম ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন। অবশেষে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ৫৫ বৎসর বয়সে কর্ম্মবীর উপেন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন।

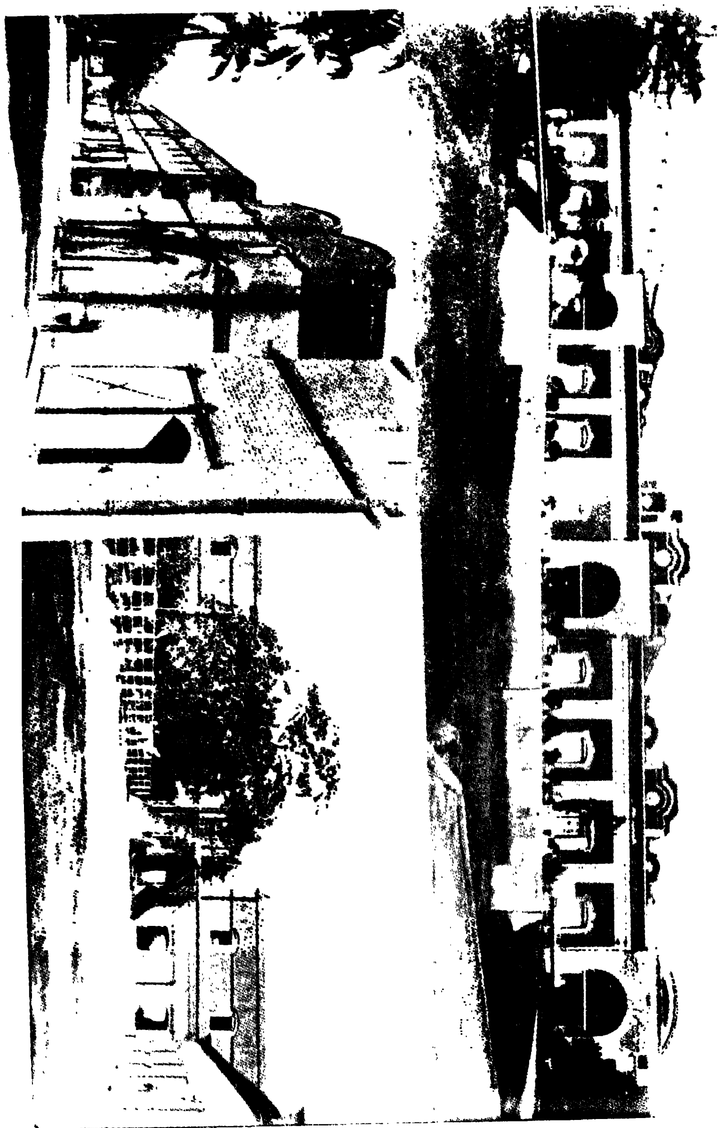
উপেন্দ্রনাথ তাঁহার উৎসাহে ও অধ্যবসায়ে, কর্ম্মে ও দানে, ঔদার্য্যে ও সাধনায় গ্রামের ও দেশের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী শীঘ্র ভুলিবে না। তাঁহার জীবিতকালে তাঁহার বহুবিধ সৎকর্ম্মের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহার

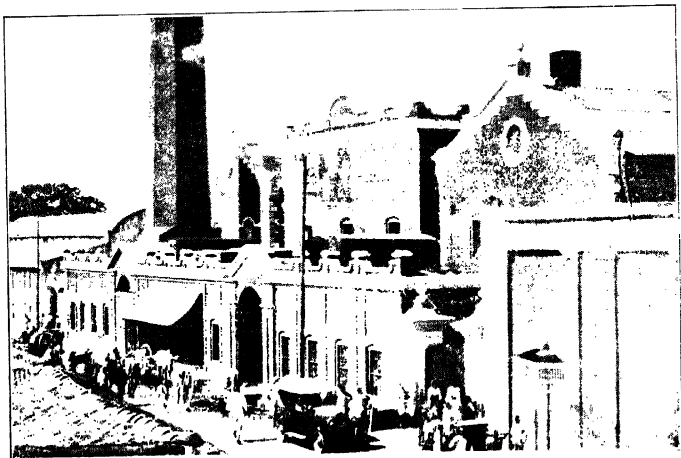
গ্রামবাসী ও দেশবাসী তাঁহাকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা দান করিয়াছে এবং রাজসরকার তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি দানে সম্মানিত করেন। এই উপাধি লাভের পর তাঁহার গ্রামবাসীরা এবং তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণ সমবেত হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। বলা বাহুল্য, অভিনন্দন-সভায় তাঁহার গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছিল। তিনি তাহাতে বলেন,—"আমাদের শাস্ত্রে আত্মশ্লাঘা করা ও আত্মশ্লাঘা শ্রবণ করা উভয়ই আত্মহত্যার তুল্য। আজ আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে আত্মশ্লাঘা শ্রবণ করিতে হইল।"

রাজসম্মান লাভ ব্যতীত, দেশের বহু সংবাদপত্রে তাঁহার কীর্ত্তিকথা বহুবার আলোচিত হইয়াছে। এই নীরব কর্ম্মী দেশবাসীর সম্মানও যথেষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে "মুসলমান" পত্র (৫ই মার্চ্চ, ১৯১৫) অন্যান্য বহু কথার মধ্যে লিখিয়াছিলেন—

"উপেন্দ্রবাবু ধন-গর্ব্বে গর্ব্বিত ছিলেন না এবং যাহাতে তাঁহার প্রতিবেশীদিগের—এমন কি আশ্রিতদিগেরও আত্মসম্মান আহত না হয়, সে-বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। অতুল ঐশ্বর্য্যে কখন তাঁহার হৃদয়ের স্থৈর্য্য নষ্ট হয় নাই। ধনীরা অনেক সময় প্রতিবেশীদিগের শঙ্কার কারণ হইয়া উঠেন; উপেন্দ্রনাথ সে নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন।"

উপেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেই অমৃতবাজার পত্রিকা (৪ঠা মার্চ্চ, ১৯১৫) যাহা লেখেন তাহার কিয়দংশ এই :—





এসক্রপ্ট্‌ প্রেস। চিৎপুর, কলিকাতা।



উপেন্দ্রনাথ সাউ-টাউন হল, বসিরহাট

"......The name of the late Rai Bahadur Woopendra Nath Sawoo, Zaminder, Dhankuria and Basirhat, known in the trade circles of Calcutta as the millionaire merchant and banker of Shambazar, will be long remembered by those who revere and cherish his memory—not for the fact that he was the master of a colossal wealth, a good deal of which he lent out to needy traders at low rates of interest and on a lenient system of repayment—but for the judicious application he made of it to every cause that tended to any public good, and the ceaseless activity and the selfless devotion with which he followed it......Young as he was at the time, he managed his estate with the ability of a practical business manager of trained intellect, devoting his whole energy and attention to the amelioration of the condition of his tenants and neighbours in every direction. The spread of a liberal education among the villagers in the midst of which he preferred to pass his days,

the encouragement of trade and agriculture with a liberal supply of capital, the construction of roads and drains, the arrangement of suitable drinking water, the improvement of sanitation, the supply of reliable medical relief to the teeming population of his native village and its neighbour-hood. who were mostly steeped in poverty and helplessness,—were some of the weightiest questions that presented themselves before the youthful attention of Woopendra, and he set about their solutions in the most practical manner imaginable······"

Amrita Bazar Patrika,
March 4, 1915

ইহা ছাড়া সেই সময়কার অপর কয়েকটি বিখ্যাত সংবাদপত্রে তাঁহার গুণগ্রামের পরিচয় বাহির হয়। এই সংক্ষিপ্ত জীবন-কথায় তাহা তুলিয়া দিবার স্থান নাই। তবে সম্প্রতি "অমৃত-বাজার পত্রিকার" সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় উপেন্দ্রনাথের পঞ্চবিংশতি স্মৃতি-সভায় যাহা বলেন, তাহার কিয়দংশ ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪০

তারিখের "অমৃতবাজার পত্রিকা" হইতে অনুবাদ করিয়া উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলেন—

"স্বর্গীয় রায় বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ সাহু বাহাদুর প্রকৃতই একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার বিরাট ব্যবসায়-কার্য্যে তাঁহাকে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিতে হইত। ইহা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার গ্রাম ও দেশবাসীকে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহারই অনুপ্রেরণায় তাঁহার অংশীদার গাইন বাবুরা ও বল্লভ বাবুরা তাঁহার সহিত পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যে যোগদান করেন এবং স্কুলের জন্য এক বিরাট গৃহ নির্ম্মাণ করেন। একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠীও এইভাবে নির্ম্মিত হয় এবং ইহার পরিচালনার জন্য অর্থ প্রদত্ত হয়। তাঁহার মাতার নামে তিনি শ্যামাসুন্দরী হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। এই হাঁসপাতালে প্রত্যহ শত শত রোগী চিকিৎসা লাভ করিতেছে। তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব এবং নিজের গ্রামে রাধাকান্ত জিউ মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে একবার বসিরহাট মহকুমায় দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়, তখন স্বর্গীয় রায় বাহাদুর এবং তাঁহার অংশীদারগণ মাসের পর মাস দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকদিগকে অন্ন ও বস্ত্র দ্বারা সাহায্য করেন।

তিনি জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি সমব্যবহার প্রদর্শন করিতেন। জনসেবার আদর্শে তিনি উদ্বুদ্ধ ছিলেন

এবং মানবতার সেবার জন্য তিনি মুক্ত হস্তে দান করিতে পারিতেন।”

আমরা বর্ত্তমানে যুগ-পরিবর্ত্তনের সন্ধিক্ষণে বাস করিতেছি। যুদ্ধরত ইউরোপের বিহ্বল অবস্থায় আমাদের দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধন এবং ব্যাপক ভাবে ব্যবসা- বাণিজ্যের প্রসার সাধন করার বিশেষ সুযোগ আমরা লাভ করিয়াছি। এই সময়ে উপেন্দ্রনাথ সাউ মহাশয়ের ব্যবসাকার্য্যের কথা আমাদিগকে বারংবার স্মরণ করিতে হইবে।

বাঙ্গালীর বাঁচিবার উপায়-সমূহের অন্যতম হইতেছে বাঙ্গলার ক্ষীণপ্রাণ পল্লীগুলিকে আবার সবল ও সুস্থ করিয়া তোলা। উপেন্দ্রনাথ পল্লীর উন্নয়ন-কার্য্যেও যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের সর্ব্বদা অনুকরণের যোগ্য। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, গ্রামবাসীগণ যদি শিক্ষিত ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হয় তবেই বাঙ্গলাদেশের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইবে। গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহাই তিনি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার পল্লীসংরক্ষণের এই মহৎ উদ্দেশ্য আমাদিগকে চিরদিন পল্লীসেবার কাজে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিতে থাকুক।

শেষ